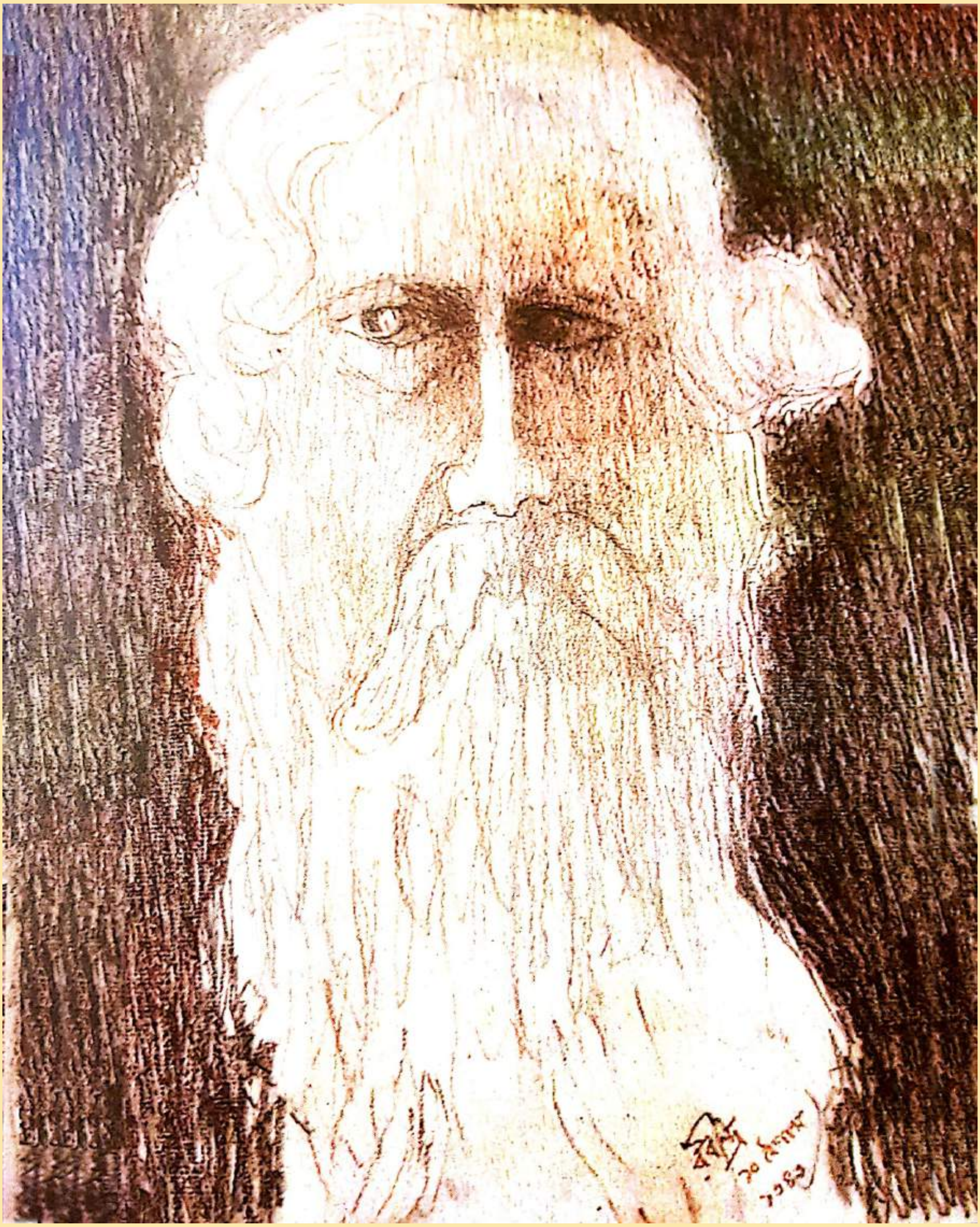

বাতায়ন

বৈশাখী

‘তুমি আদিকবি কবিগুরু তুমি হে’

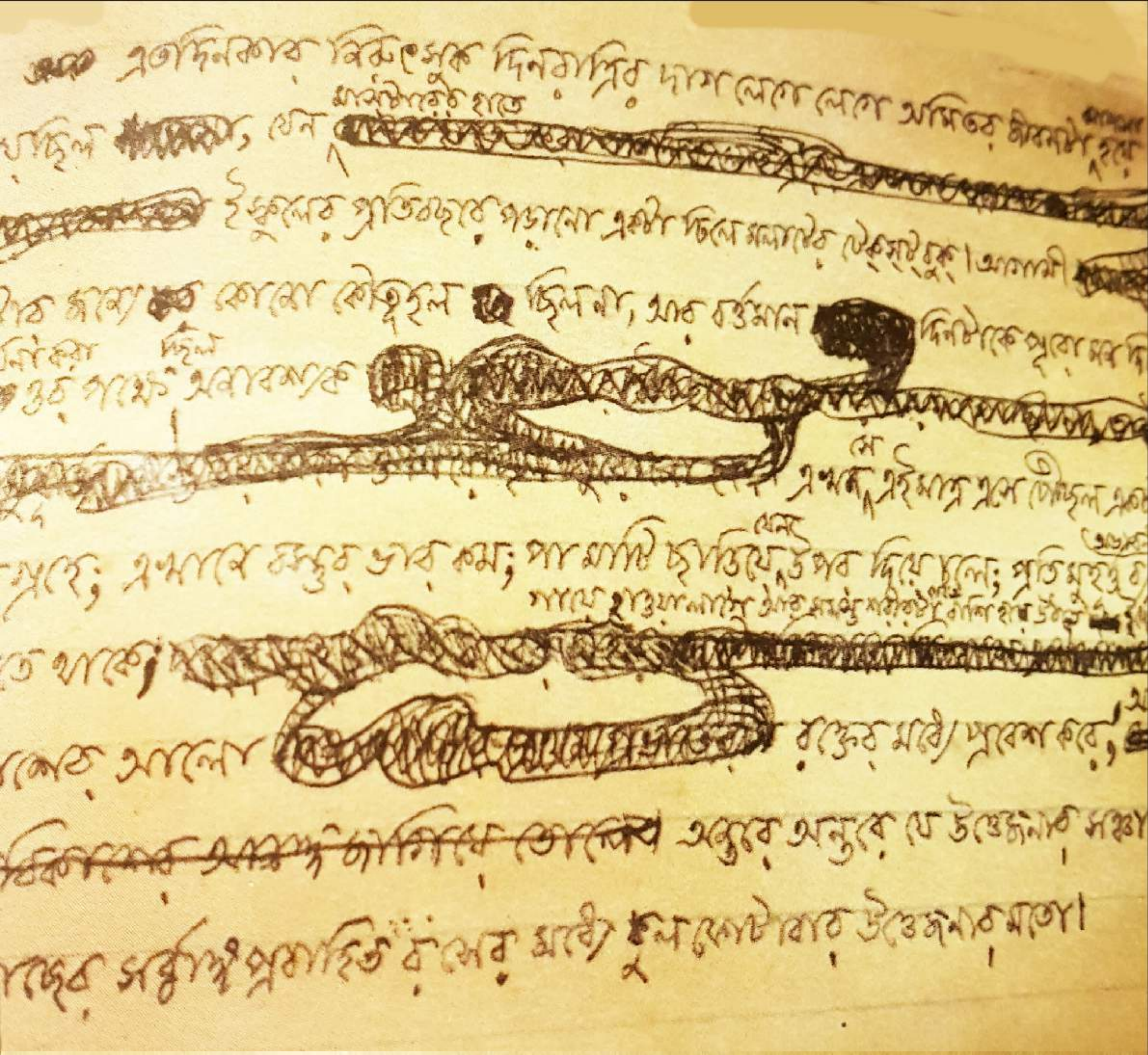

আমন্ত্রিত সম্পাদক
তন্ময় চক্রবর্তী

সম্পাদিকা
রঞ্জিতা চ্যাটার্জী

Volume 25 | May, 2021

Batayan

A literary magazine with an International reach

Issue Number 25 : May, 2021

ISBN: 978-0-6487688-5-2

Guest Editor
Tanmoy Chakraborty, Kolkata

Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Melbourne, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registration No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Front Cover, Inside Back Cover & Back Cover : Painting by Rabindranath Tagore — collected from Thakurbarir Chitrakala, Deys Publishing.

Inside Front Cover — Rabindranath Tagore Photo : From "BALAKA" 1st edition published by Indian Press, Allahabad, India in 1916.

The Article — A GLIMPSE OF THE PAST

This article has been taken from **রবীন্দ্রশতায়ন** — A commemorative publication by Bethune Collegiate School, on the occasion of the Tagore's Centenary celebration.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়র বদলে....

এইসব অসম্ভব ভয় দেখানো দিনে
তুমি যদি হঠাৎ রবিঠাকুর ...
কোন দেশে কে লিখছে কেমন
জলের ধারে জড়িয়ে ধরে দুপুর।

তারপরে খুব বৃষ্টি এল
সহজপাঠে বানান ক্লাশে
এক্কাদোক্কা খেলা।
মেঘের ভিতর শোক জমেছে
কেউ কি কেঁদে গেল
শহর জুড়ে মৃতদেহের মেলা।

জানি, তুমি এসব দেখেও গান।
ভেঙে যাচ্ছে সংসার ঘর
অথচ গীতবিতান ....

সেই মেয়েটি, তোমায় কেন
এখনও খোঁজে জানি।
পুড়তে পুড়তে হাওয়ায় ওড়ে ছাই।
অন্ধকারে অমৃতপাত্র হাতে
ছায়ার মায়ায় 'মন বলে চাই চাই'।

'প্রভু আমার'। 'ভালোবাসার ধন'।
এ দুর্দিনে। তোমায় নিয়ে। আমরা কয়েক জন ....

তন্ময় চক্রবর্তী
কলকাতা
৩০ বৈশাখ ১৪২৮

‘নব অরুণোদয় জয় হোক’

“এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন এক জ্যোর্তিময় দেবতার ভালবাসাবাসি চলছে – তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধসুখের ভাব, গাছে পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নীলিমা।”
(ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী ১৩৯৯, পৃ ৬৯)

রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল সুরটি হল জীবনের জয়গাথার সুর। তাঁর বাণীতে দুঃসময়ের অন্ধকার পার হয়ে যাওয়ার অমোঘ উচ্চারণ। তাঁর ‘জ্যোর্তিময়’ এক অর্থে জীবনের প্রতীক। মানবসভ্যতার ইতিহাসে আলোর উৎস হিসেবে সূর্যের প্রতীকী তাৎপর্য আছে। আমাদের এই গ্রহটির প্রাণের উৎস ও বিকাশ সূর্যের অবদান। তাঁর এই দান অফুরন্ত। বাঙালিজীবনে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা অনেকটা সূর্যেরই মতো। যে আলোর কথা তাঁর কাব্যে ঘুরেফিরে এসেছে তাঁর রচনা আমাদের দেয় সেই আলোর আশ্রয় ও আশ্বাস।

“চাহে সে বাসিতে শুধু ভালো / চাহে সে করিতে শুধু আলো”, ধরণী আর সূর্যের সম্মিলনের রূপটি মনে আশা জাগায়। জাগায় সুন্দরের প্রতি আস্থা। তাঁর রচনায় তাই অনিবার্যভাবে আলোর প্রসঙ্গ এসেছে প্রাণপ্রাচুর্য্য আর গতিশীলতা বোঝাতে। কবির নিজের জীবনে অন্যতম আনন্দের অনুষঙ্গ হল তাঁর সৃষ্টিশীলতা। কবিতা তাই তাঁর কাছে আসে প্রভাত আলোর মতো। দিনের আলোর প্রকাশে বিদায় নেয় রাতের সখা শুকতারা। সেজন্য বেদনার বোধও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। অন্ধকারের উপস্থিতি ব্যতীত আলোর ঔজ্জ্বল্যের অনুভব সম্ভব নয়। তাই অন্ধকারের প্রয়োজন আছে। তবে জীবন প্রাণ পায় আলোতে। তাঁর কবিতায় অন্ধকার ও একাকিত্বের অবসানে নতুন দিনের সূচনা হয়।

“জেগেছে নতুন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,
ওই দেখো পোহায়েছে রাতি।”

(সমাপন /প্রভাত-সংগীত)

আলোর বিপ্রতীপে যে অন্ধকার, জীবনের বিপ্রতীপে যে মারের সাগর তা পার হওয়ার শক্তি আমরা পাই তাঁর এই আলোকময় দর্শন থেকে। তাঁর চিন্তায় মৃত্যু জীবনের একটি নিশ্চিৎ পরিণতি মাত্র। কবির ব্যক্তিজীবনে ‘দুঃখের আঁধার রাত্রি’ বারে বারে এসেছে। এসেছে ‘ত্রাসের বিকট ভঙ্গি’ নিয়ে। কিন্তু তাঁর উপলব্ধিতে মৃত্যুর কোনো শাশ্বত মহিমা নেই। সে মহিমা কেবল জীবনেরই প্রাপ্য। জীবন ও জগতের আনন্দময় রূপের উদযাপন তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিতে। মানবজন্মের সার্থকতা মানুষকে ভালবেসে, প্রকৃতিকে ভালবেসে। এই সুরটি অনুরণিত তাঁর কবিতা, গল্প, গান ও নাটকে।

‘প্রত্যহের সব ভালবাসা
তারি আদি সোনার কাঠিতে
উঠেছে জাগিয়া ;
প্রিয়ারে বেসেছি ভালো ,
বেসেছি ফুলের মঞ্জরিকে ;
করেছে সে অন্তরতম
পরশ করেছে যারে।’

(জীবন পবিত্র জানি / ৭ সংখ্যক)

স্বজন হারানোর এই মুহূর্তে তাই রবীন্দ্রনাথ। বাতায়ন রবীন্দ্রসংখ্যা (বাংলা ১৪২৮ সাল) পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। পঁচিশে বৈশাখ পার হয়েছে দিনকয়েক আগেই। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে রবীন্দ্র অনুরাগ তো দিনক্ষণের মাপকাঠিতে বাঁধা নয়। তাই বাতায়নের এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য বন্ধুরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন জানি।

এ অপেক্ষা ভাললাগায় ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে পত্রিকাটি খুলে পড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ শ্রী অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ এবারের ‘বাতায়ন রবীন্দ্রসংখ্যা’। তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা নেই। বাতায়ন পরিবারের লেখক পাঠক সদস্যদের কাছে এ এক পরম প্রাপ্তি। আছে স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্তের লেখা। এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণের তালিকা এখানেই শেষ নয়। সুপ্রতীক মুখার্জীর সৌজন্যে আমাদের বিশেষ প্রাপ্তি পুরোনো দিনের স্বর্ণখনি থেকে সংগৃহীত নিবন্ধ। সুপ্রতীক রবি জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরম আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই কবি, প্রাবন্ধিক ও কলামনিস্ট তন্ময় চক্রবর্তীকে। তন্ময় ভালবেসে পত্রিকাটির সঙ্গে আছেন অনেকদিন। এবারের রবীন্দ্রাসংখ্যাটির তিনি আমন্ত্রিত সম্পাদক। পত্রিকাটির গুণগত মানের উৎকর্ষসাধনে তাঁর বিশেষ অবদান আছে।

ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই আমাদের সব বন্ধুদের। নিরাময়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অপেক্ষমান রবীন্দ্রসাহিত্যের বিপুল সম্ভার। এই দুঃসময়ে তাই আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরা তাঁকে। আসুন আমরা সকলে মিলে রবীন্দ্রাভাবনায় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

ধন্যবাদান্তে,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, বাতায়ন পত্রিকা গোষ্ঠী

আলোকচিত্র – সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, শিকাগো, ইউ.এস.এ

সূচীপত্র

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়

ভিত্ 10

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

স্ত্রী বিয়োগঃ অশ্রুসিক্ত কবিতার জন্মঃ রবীন্দ্রনাথ 31

প্রচেত গুপ্ত

যেমন খুশি রবীন্দ্রনাথ 37

সুরজিৎ রায়

সহজিয়া রবি 39

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসংগীত ও ব্যক্তিগত অনুভব 41

জয়তী রায়

অভিমানী রবিবার 43

শ্যামলী আচার্য

তুমি আমাদের পিতা 45

সংগ্রামী লাহিড়ী

রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণুপুর ঘরানা 50

উদ্দালক ভরদ্বাজ

রবীন্দ্রনাথ 55

অমর্ত্য দত্ত

পূজা 57

সঞ্জয় চক্রবর্তী

ঈশ্বর সংলাপ 58

সুজয় দত্ত

প্রশ্ন 59

বিদিতা ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তী

তিনি আমার রবীন্দ্রনাথ 60

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

বৈশাখের সেই পুরুষ ... 61

সুস্মিতা রায়চৌধুরী

প্রেমপর্যায়-প্লেটনিক, শারীরিক না রবিঠাকুর ? 62

সৌমিত্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আধ্যাত্মিকতা 66

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার রবীন্দ্রনাথ 67

নাভিদ সালেহ

আমার রবিঠাকুরঃ একজন নিগূঢ় পরিবেশবাদী 70

মৌসুমী ব্যানার্জী

ওদের রবীন্দ্রনাথ 72

দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা 76

অদিতি ঘোষদস্তিদার

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথঃ প্রকৃতি নিজেই যখন চিত্রকর 77

তপনজ্যোতি মিত্র

তীর্থযাত্রার পথ 81

পারিজাত ব্যানার্জী

কাল্পনিক কথোপকথন বৃত্তহীনা 84

অমৃতা মুখার্জী

ভাষার অহংকার 89

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায়

সীমানা ছাড়িয়ে 91

ইতিহাসের পাতা থেকে

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বেদীতে উপবিষ্ট সস্ত্রীক সিলভ্যাঁলেভি ও শ্রীমতী হাতি সিং।

মাটিতে উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) অমিয় চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফণীন্দ্রনাথ বসু, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, হরিদাস মিত্র ও হরিপদ রায়।

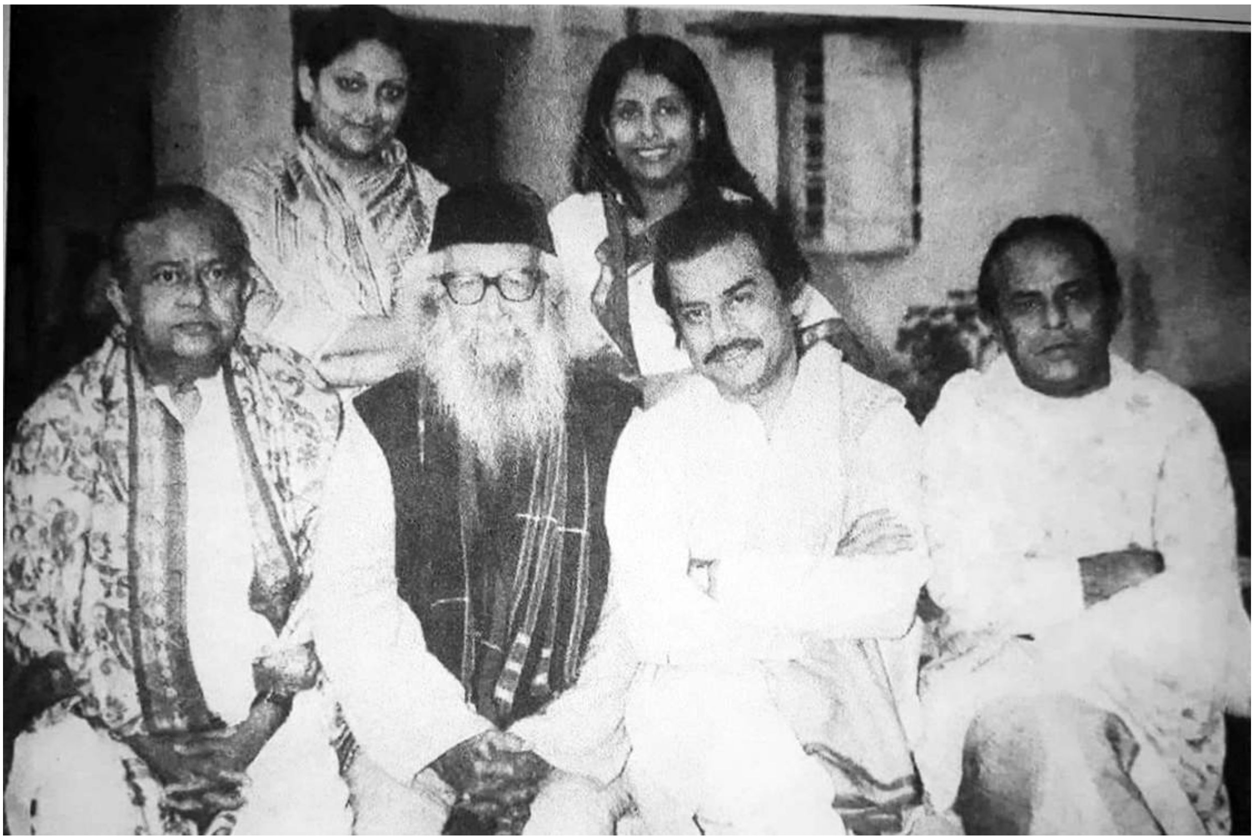

শান্তিনিকেতনে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁদিক থেকে প্রভাত মুখোপাধ্যায়,
অনুপ কুমার, রবি ঘোষ, সোমা দে, শিবানী বসু

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়

ভিত্

প্রসঙ্গ: শান্তিনিকেতন-বোলপুরে সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়-এর স্থান ও ভূমিকা। তিনি কি পেয়েছিলেন, কি দিতে পেরেছিলেন।

প্রেক্ষাপট: প্রভাতকুমার ও সুধাময়ী শান্তিনিকেতন আশ্রমের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৫ সালে বোলপুরে সংসার বাঁধেন। বোলপুরে বসবাসের উন্নয়ন এবং সামাজিক তথা শিক্ষাগত ভিত্ গড়ার অন্যতম অগ্রণী ছিলেন তাঁরা।

সুধাময়ী দেবী এবং প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
সাল জানুয়ারী ১৯৭৯
(পৌত্র সুমন্তর বিবাহ উপলক্ষ্যে গৃহীত আলোকচিত্র)

Prabhat Kumar and Sudhamayee with youngest son Visvapriya and family – Sunanda, Priyadarsi and Supratik. Bolpur house. 31 December 1971.

এই লেখাটি প্রচেষ্টার শুরুতেই "বাতায়ন"-কে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এই কৃতজ্ঞতা নেহাৎই ব্যক্তিগত কারণে নয়। বাংলা, তথা, ভারতের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস ও ধারাবাহিকতার লিখিত সংরক্ষণে বাতায়নের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য। আমরা যাতে ভুলে না যাই।

স্মৃতিচারণায়, যে ইতিহাস আপনাদের কাছে পরিবেশনা করছি, তা'র পটভূমিকা আপনাদের কাছে পরিচিত। স্বভাবতই, এই পটভূমির তাৎপর্য আপনারা বিশ্লেষণ ক'রে নেবেন।

স্বর্গীয় সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় আমার বড়জ্যেঠু। প্রভাতকুমার-সুধাময়ী-র বড় ছেলে।

স্বর্গীয়া সুনন্দা মুখোপাধ্যায় আমার মা। প্রভাতকুমার-সুধাময়ী-র ছোট বৌমা।

আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদনে ব্যক্তিগত কারণটি তেঁতুলপাতা-র মতো – আপাত নগণ্য, তবু ন'জন-এর কাছে গুনগুন করার যোগ্য। আধুনিক সময় ও সমাজের সূচক। পূর্বপুরুষের কাছ্ থেকে না-চাইতেই পাওয়া স্থাবর সম্পত্তি রাখার অযোগ্যতা, এবং সেই কারণে পারিবারিক অস্তিত্ব থেকে নির্মূল হওয়া।

বোলপুর-এর "ভুবনডাঙা"-য় প্রভাত কুমার – সুধাময়ী-র বাসা – শান্তি, শ্রম, সৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির নীড় – আজ বিলুপ্ত। যে মাটির ওপর ঘর ও স্বপ্ন গেঁথেছিলেন, তা' আজ সেই মাটিতেই মিশে গেছে। ১৯৩৫ সালে শুরু ক'রে, তিন প্রজন্মেই ধুলো !

সেই সঙ্গে ধূসর হয়েছে বোলপুরে বয়ে আসা শান্তিনিকেতন আশ্রমের সবুজ ধারা। এখন স্মৃতিই নির্ভর।

যদিও, উড়ো স্মৃতি গুলোর বসার ঠাঁইও নেই – বাড়ি ? নেই ... গাছ ? নেই ... ভেজা মাটির রাস্তা ? নেই ... ছাতার্, কাঠঠোক্রা, কাঠবেড়ালী গুলো ? কোথাও হয়তো flat বাড়িতে মানিয়ে থাকার চেষ্টা করছে, বা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে !!

ফলে, স্মৃতিচারণার লেখনীতে, স্মৃতির ইঁট গেঁথে গেঁথে, কিছু ইতিহাস উদ্ধার করার অবকাশ দিলেন, "বাতায়ন"।

বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাই।

শান্তিনিকেতনের "শ্রেয়সী" পত্রিকা সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চয় জানেন। বঙ্গাব্দ ১৩৯৬-এর সংখ্যা থেকে এই দু'টি লেখা নিবেদন করলাম।

নব-পর্যায় ৭ই পৌষ ১৩৯৬ শান্তিনিকেতন

সুনন্দা মুখোপাধ্যায় -
২৩শে ডিসেম্বর -১৯৮৯

শ্রেয়সী

নবপর্যায় ষষ্ঠ সংখ্যা

৭ই পৌষ ১৩৯৬

সম্পাদিকামণ্ডলী

ক্ষমা মুখোপাধ্যায় দেবশ্রী ঘোষ খনা বসু বিজয়া দাস

উমা পান মায়া মৈত্র সুনন্দা মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিকা

অমিতা সেন

আলাপিনী মহিলা সমিতি

শান্তিনিকেতন

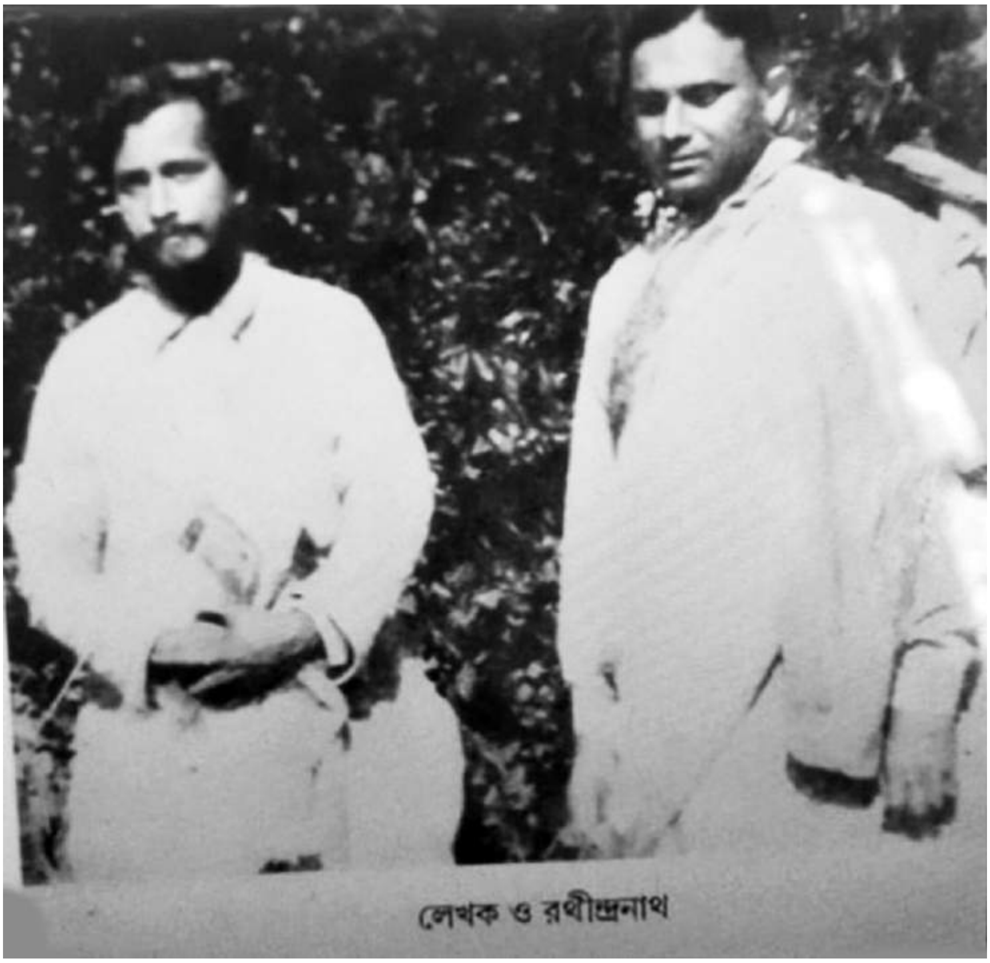

লেখক ও রথীন্দ্রনাথ

সুধাময়ী দেবী

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

প্রাচীনকালের গুরুগৃহ এবং আশ্রমের আদর্শ নিয়ে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিকল্পিত হয়েছিল, তারই সৃজন বা সংগঠনের কাজে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় কিছু সংখ্যক বিদগ্ধ এবং কর্মী মানুষ। আশ্রমের গুরু এবং সেবকরূপে তাঁদের পরিচয় আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু যে সব গুরুপত্নী বা আশ্রমজননীরা নীরবে আশ্রমের বহুবিধ কর্মধারায় সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের অবদানের কথা প্রায় অজানা। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেনের নিঃশব্দ সেবা আশ্রমের ক্ষুদ্র সমাজজীবনে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছিল তাও অনুসন্ধিৎসু অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। তৎকালীন শিক্ষক ও গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী, আমার মা, শ্রীযুক্তা সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় ছিলেন সে যুগের আশ্রমজীবনের অন্যতমা এক সংগঠিকা। একথা সাম্প্রতিক কালের মানুষজনের কাছে অজানাই। ১৯১৯ সালে আশ্রমে বধূরূপে এসে সুধাময়ী দেবী আশ্রম ও বিদ্যালয়ের আত্মিক ও সামাজিক রূপায়ণের কাজে সার্বিক না হলেও অংশতঃ আত্মনিয়োগ করেন। বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ও রূপায়ণের চিন্তা তখন সবে দেখা দিয়েছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আহ্বান, নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেশ বিদেশের সারস্বত সমাজে। আশ্রম বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এসে মিলিত হলেন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র, সিংহল, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে জ্ঞানীগুণীবৃন্দ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও এলেন অনেকে। শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষার্থীদের মিলিত কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত হ'ল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পঠন, পাঠন, গবেষণা শুরু হ'ল। পাঠ্যবিষয়ে আন্তরিক আগ্রহী অল্প কয়েকজন শিক্ষার্থী- ও শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে সুধাময়ী দেবীও ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী সুধাময়ীর দর্শন এবং সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে ছিল একান্ত আগ্রহ। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীর সহায়তায়। বিশ্বভারতীর সূচনা পর্বে শিক্ষাদান ও গ্রহণের মাধ্যমে গড়ে উঠল এক পারস্পরিক সহযোগিতা। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' — এর আসল রূপটির দানা বাঁধলো তখনই। ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টিতেও তখন শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছেন অনেকেই। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় সুধাময়ী দেবী বালকদের ইংরাজী ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে পরবর্তী জীবনে কেউ কেউ গুণী সমাজে খ্যাতি এবং সমাদর লাভ করেন। প্রখ্যাত শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শিল্পী মণীষী দে তাঁর ছাত্র ছিলেন সেই সময়। বিদ্যাভবনের বিশিষ্ট প্রাক্তন অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ উপেন্দ্র কুমার দাসও তাঁর ছাত্র ছিলেন।

রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ প্রয়াত পুলিনবিহারী সেনও ছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহাস্পদ। পুলিনবিহারী একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে নিজগৃহে এনে পুত্রবৎ শুশ্রূষা করে ভাল করেন সুধাময়ী দেবী। উদীয়মান কবি শিল্পী ছাত্রবৃন্দকে এবং তাঁদের সুহৃদবর্গকে তাঁদের কাব্যসৃষ্টি বা শিল্পচর্চায় উৎসাহিত করতেন তিনি। এঁদের মধ্যে পরবর্তী যুগে খ্যাতিমান হ'ন কবি নিশিকান্ত, শিল্পী সুধীর খাস্তগীর প্রভৃতি। স্বদেশী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হ'ন সান্ত্বনা গুহ। বিপ্লবী বলে চিহ্নিত হয়ে তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে ইংরাজ শাসকদের নিষ্ঠুর কারাগারে। অকাল প্রয়াণ ঘটে অস্ফুট কবি-প্রতিভা নিয়ে সুকুমার সরকারের। এঁরা সবাই স্নেহ, অনুপ্রেরণা এবং সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সদুপদেশ পেয়েছিলেন সুধাময়ী দেবীর কাছে। বিশ্বভারতীর শিক্ষার মধ্যে আত্মস্ফুরণের এই সব উদাহরণেরও স্থান রয়েছে বিশেষভাবে। নিজস্ব চিন্তা বা আত্মপ্রকাশের বিকাশ ঘটার বিষয় আশ্রমগুরু ছিলেন সজাগ। সুধাময়ী দেবীকে ইংরাজী রূপকথার বাংলা অনুবাদ করার বিষয় উৎসাহিত করেছিলেন এবং তিনি মনে করতেন প্রত্যেকের নিজস্ব কর্মের স্ফুরণ হলে সেটাও হবে আশ্রমজীবনের বিচিত্র কর্মসূচীর একটি বিশেষ ধারা। শান্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র মহিলামণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা। প্রকাশিত হ'ল 'শ্রেয়সী' পত্রিকা শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেনের সম্পাদনায়। সুধাময়ী পত্রিকাটির নিয়মিত লেখিকা হলেন। তৎকালীন আশ্রম-মুখপত্র 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকাতেও সুধাময়ী লিখে চললেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। বিদ্যালয়ে ক্রমে ক্রমে আস্‌তে লাগ্‌ল দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিশু, বালকের দল। তাদের অভিভাবকেরাও নিশ্চিন্ত তাদের এই সুন্দর পরিবেশে রেখে। গ্রীষ্মাবকাশে দেশের দূর অঞ্চল থেকে আসা অনেক শিশু, বালকেরাই যেতে পারত না তাদের বাড়ি। মাতৃস্নেহের পরশ পেত তারা গুরুপত্নীদের কাছে। আমাদের বাড়িতেও থাক্‌ত দক্ষিণ ভারতের দুটি ছাত্র; তাদের নাম গণেশ ও নারায়ণ। ব্রহ্মদেশের দুটি বালকও থাক্‌ত সেইসঙ্গে; নাম তাদের টুনসাং, টুনাং। তাদের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী খাদ্য পরিবেশন করতে হ'ত। সুধাময়ী দেবী এই দুই প্রান্তের ছাত্রগুলিকে সর্বদা তাদের অভিরুচি অনুযায়ী খাদ্য পরিবেশন করে এবং মাতৃস্নেহের পূর্ণ স্পর্শে আনন্দিত রেখেছিলেন। নিজের বাড়ির অভাব তারা কোনও দিনই বুঝতে পারেনি। বিশ্বভারতীর কর্মধারার মধ্যে দুটি দিক আছে,—একটি জ্ঞানার্জনের, অন্যটি সামাজিক শিক্ষার। প্রতিবেশী অঞ্চলগুলিতে মানবসমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতিকে যথাযথভাবে প্রসারিত করাও বিশ্বভারতীর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৩১ এর সেপ্টেম্বর মাসে শান্তিনিকেতন আশ্রম এলাকায় আশ্রম বাসিন্দাদের শিশু ও পল্লী অঞ্চলের শিশুদের নিয়ে একটি মিলিত শিশু প্রদর্শনী হয় এবং তাতে স্বেচ্ছাসেবিকা হয়েছিলেন অনেক ছাত্রী। বিশ্বভারতীর স্বাস্থ্যবিভাগেরও অংশ ছিল এই প্রদর্শনীতে। এটিকে সংগঠিত ও পরিচালিত করেন সুধাময়ী দেবী। ১৯৩১ সালে শ্রীনিকেতনে ছিলেন হ্যারি টিম্বার্স। তিনি জাতিতে

আমেরিকান, পেশায় চিকিৎসক। তাঁর স্ত্রীর ছিল সমাজসেবার আগ্রহ। Visva Bharati News (May 1933)-এ আমরা পাই যে সুধাময়ী দেবী শ্রীমতী টিম্বার্সকে সহায়তা করছেন একটি শিশুপ্রদর্শনীতে। বিশ্বভারতীর পল্লীসংগঠন বিভাগের উদ্যোগে বিনুরিয়া পল্লী অঞ্চলে এই শিশু প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। সমাজসেবায় বিশ্বভারতীর কাজে সুধাময়ী দেবী সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। এর কিছুকাল পরে শিক্ষাভবন ও পাঠভবনের শিক্ষিকারূপে তিনি আশ্রমের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। ছাত্রছাত্রীদের তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন সাহিত্যসভায় রচনা পাঠ করতে, গুরুদেবের কাব্যনাটক রূপায়িত করতে, পৌরাণিক কাহিনীর জ্ঞান বিষয় প্রতিযোগিতা সভার আয়োজন করতে। ছাত্রীনিবাস 'শ্রীভবনের' বিদেশিনী অধ্যক্ষা মাদামোয়াজেল বসনেককে সাহায্য করেছেন ছাত্রীদের নিয়মশৃঙ্খলার অনুশীলন করাতে।

রবীন্দ্রভাবনাকে যথাযথভাবে প্রচারিত করা বিশ্বভারতীর কর্মপদ্ধতির প্রধান অঙ্গ। পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে সেই শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রবাহকে সঞ্চারিত করাও প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি জনের কর্তব্য। শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দির মধ্যে সীমায়িত থাকলে রবীন্দ্রচিন্তার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। সুধাময়ী দেবী রবীন্দ্রচিন্তা সম্প্রসারণের সাধনায় অন্যতমা ব্রতী। এমন কি গুরু-পল্লীতে তাঁর নিজগৃহে যে সাংস্কৃতিক আবহাওয়াটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন সেই আবহাওয়ায় পুষ্ট হয়ে অনেকেই পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রসংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন। সাম্প্রতিক-কালের রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বনামধন্যা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অল্প বয়সে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষা বা অনুপ্রেরণা পান সুধাময়ী দেবীর কাছে। কন্যাসমা বালিকাটিকে তিনি তার সুললিত কণ্ঠের জন্যে সযত্নে শিখিয়েছিলেন কতকগুলি আপাত কঠিন সুরের রবীন্দ্রসঙ্গীত। নিজ কনিষ্ঠা ভগ্নী-পুত্র সুবিনয়কেও তাঁর বালক বয়সে দিয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে মাধুর্যের সন্ধান। সুধাময়ী নিজেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিষ্যা ছিলেন দিনেন্দ্রনাথের। আশ্রমের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুধাময়ী দেবীকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করতেন অনেকেই তাঁর সেবাপরায়ণতার জন্য — একথা আগেই উল্লেখ করেছি তৎকালীন ছাত্র পুলিনবিহারী সেনের প্রসঙ্গে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারার মধ্যে সেবাশুশ্রূষাও একটি প্রধান বিষয়।

আশ্রম সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমে তিনি বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রতিনিধিরূপেই গৃহের প্রাচীরের বাইরে জ্ঞানকে মুক্ত করলেন। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলিত, সংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন অঞ্চলে দিলেন মুক্তির সন্ধান। অন্ধকারের উৎস থেকেই উৎসারিত হ'ল যে আলোর রশ্মি, তাতেই জেগে উঠল আলোকপ্রাপ্ত এক বিরাট নারীসমাজ। 'বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ে'র উন্নত প্রতিষ্ঠায় ঘরে ঘরে গৃহ দীপ জ্বলে উঠল। বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শ, গুরুদেবের চিন্তাধারা যেন মুক্তধারার মত প্রবেশ করল অন্ধকার মহাসমুদ্রে। তরঙ্গ তুলল, স্পন্দন জেগে

• সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ২ জুলাই ১৮৯৬—মৃত্যু : ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধেয়া সুধাময়ী দেবীকে প্রণাম

আলাপিনী মহিলা সমিতি

শান্তিনিকেতন

উঠল স্তব্ধ তটে। বিদ্যালয়রূপী সেই মহীরুহটি আজ ফুলে ফলে সমৃদ্ধ। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর সস্নেহ সহায়তায় শান্তিনিকেতনের মহিলা মহল 'আলাপিনী'তে আনলেন প্রতি সভ্যার মধ্যে মৌলিক রচনার অনুপ্রেরণা। প্রকাশিত হ'ল 'ঘরোয়া' পত্রিকা সুধাময়ী দেবীর সম্পাদনায়। 'রবীন্দ্র রচনার ইংরাজী অনুবাদ সূচী' সংকলন করে বিদেশী রবীন্দ্র গবেষকমণ্ডলীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

আজ গুরুদেবের আদর্শ ও চিন্তাধারার রূপায়ণে যাঁদের নাম স্মরণীয়, তাঁদের সঙ্গে প্রয়াতা সুধাময়ী দেবীর নামও সংযোজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

"আনো শক্তি, আনো দীপ্তি, আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি, / আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা, আনো নিত্য ভালো। / এসো পুণ্য পথ বেয়ে এসো হে কল্যাণী / শুভ সুপ্তি, শুভ জাগরণ দেহো আনি। / দুঃখ রাতে মাতৃবেশে জেগে থাকো নির্নিমেষে / আনন্দ উৎসবে তব শুভ্র হাসি ঢালো।"

"শান্তিনিকেতনবাসিনীর কথা"

সুনন্দা মুখোপাধ্যায়

'আলাপিনী মহিলা সমিতি'র অধিবেশন শুরু হ'বার ঠিক আগে অমিতাদি (শ্রদ্ধেয়া অমিতা সেন) আমাকে ডেকে বল্লেন, "দেখো, বাবলুর বৌ — তোমার শাশুড়ী সুধা বৌদির বিষয়ে তোমাকে লিখতে হবে 'শ্রেয়সী'র আগামী সংখ্যার জন্য। তাঁর কথা জানা আজকালকার সকলের, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের মহিলাদের খুবই দরকার।" — এরপর 'গল্পভারতী'র (মাসিক পত্রিকা— ১৩৮১-৮২) বেশ কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়ের লিখিত 'জীবনদোলা' নামক আত্মকথা ও আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই লেখাটি সংকলনে উদ্যত হই।

— ১৯৫৯ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি আমি এই মুখার্জি পরিবারের (শ্রীপ্রভাত কুমার মুখার্জির পরিবার) কনিষ্ঠ পুত্রবধূরূপে বোলপুরে আসি। এখানে আসার আগে আমি আমার শ্বশ্রুমাতা শ্রীযুক্তা সুধাময়ী দেবীকে দু'বার দেখার সুযোগ পাই। প্রথম সাক্ষাৎ হয় তিনি যখন আমাকে দেখতে আমাদের বাড়ী আসেন। আমাকে প্রথমেই প্রশ্ন করেন আমি গাইতে পারি কিনা। এরপর তিনি একটি গান শুনতে চান। একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনাতেই তিনি খুব খুসী হয়ে যান। — গানই ছিল তাঁর প্রাণ — এটা বুঝতে পেরেছিলাম বোলপুরের বাড়ীতে পা দিয়েই। সাধারণতঃ বেশীর ভাগ বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব একত্র হওয়া মানেই হৈ-চৈ করে গল্প আড্ডা দেওয়া। কিন্তু এ বাড়ীতে তার বদলে বসতো গানের আসর। কেউ হারমোনিয়াম বা অর্গান নিয়ে, কেউ বেহালায় আবার কেউ বা এসরাজ নিয়ে বসে যেতেন। বেশীর ভাগ সময় মা-ই গান পরিচালনা করতেন। এই রকমভাবে গান শুনতে পেয়েছি তাঁর ৮০ বছর বয়স পর্য্যন্ত। পরবর্তীকালে কানে কম শুনতেন বলে গাইতে অসুবিধা হতো কিন্তু গানের কথা ছিল মুখস্থ। কোনদিন তাঁকে 'গীতবিতানের' পাতা খুলে গাইতে দেখিনি। তাঁর মতো স্থান, কাল, পাত্র বিচার করে গান বেছে অতি অনায়াসেই আসর পরিচালনা করার ক্ষমতা খুব কম দেখেছি।

আমাদের বৌভাতের আগের দিন অভিনীত হয় মা-র পরিচালনায় কবিগুরুর 'বাল্মিকী-প্রতিভা।' একে গ্রীষ্মকাল তার উপর আত্মীয়কুটুম্বের ভিড়, তার মধ্যে পাড়ার বাচ্চাদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান করানো আজকালকার দিনে বিরল বল্লেই চলে। এর পরেও

দেখেছি 'রামের বনগমন' 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' 'নটীর পূজা' ইত্যাদি করাতেন ভুবনডাঙ্গার বাড়ীর বারান্দায় কাপড় টাঙ্গিয়ে।

সুধাময়ী ছিলেন প্রকৃত 'শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসিনী' যদিও ১৯৩৫ সাল থেকে তাঁরা বাস করতেন আশ্রমের বাইরে ভুবনডাঙ্গায়। তিনি প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন শ্রীমোহিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯১৫ সালের গরমের ছুটির আগে কবিগুরুর সদ্যরচিত 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় দেখতে। তাঁর ভাষায়—"ফাল্গুনী দেখতে যারা এসেছিলেন তাঁরা আর আশ্রমবাসীরা সমবেত হলেন সন্ধ্যাবেলা নাট্যঘরে। তখন নেই আশ্রমে বিজলী বাতির আলোকসম্পাত। মঞ্চসজ্জা অনাড়ম্বর, স্বাভাবিক। ...... কবিগুরুর অন্ধবাউল সেজে গান 'ধীরে বন্ধু গো ধীরে ধীরে, চল তোমার বিজন মন্দিরে'— শ্রোতাদের নিয়ে গেলো সেই রাজ্যে যেখানে অরূপ বীণা লুকিয়ে বাজে। দিনুবাবুর চালনায় নবযৌবনের দলের গান জগদানন্দ বাবুর দাদা সেজে চৌপদী আওড়ান, ক্ষিতিমোহনবাবুর 'চন্দ্রহাসে'র ভূমিকায় বুড়োর সন্ধানে এগিয়ে যাওয়া আর বুড়োর সাজের আড়ালে যে নবীন সর্দার (প্রভাতকুমার) তাঁকে খুঁজে পেয়ে চন্দ্রহাসের হাসি নবযৌবনের দলে নিরাশায় ভেঙ্গে পড়া প্রাণে আবার এনে দিল আবেগ, এ সমস্ত মিলে 'ফাল্গুনী'র রস জমিয়ে তুলেছিল সকলের মনে।"

এর পরের বছর হলো মোহিতবাবুর সঙ্গে সুধাময়ীদেবীর মেজদির বিবাহ এবং তখন তাঁর আলাপ হয় মোহিতবাবুর মেজভাই প্রভাতবাবুর সঙ্গে। ১৯১৭ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সুধাময়ীদেবী বি.এ পাস করেন ২১ বছর বয়সে এবং সেইসময়ে প্রভাত-বাবু যান কলকাতার সিটি কলেজের লাইব্রেরিয়ানের কাজ করতে। এঁদের মধ্যে ক্রমে আলাপ হয় ঘনিষ্ঠ এবং যার ফলে তাঁরা ১৯১৯ এর ২৭শে মে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। ইতিমধ্যে প্রভাতকুমারও ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনের কাজে। সুধাময়ীদেবী লিখেছেন— "১৯১৯এ গরমের ছুটীর মধ্যে আবার এলাম শান্তিনিকেতনে। বড়মা হেমলতা দেবী, কবিগুরুর পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী, দিনুবাবুর স্ত্রী কমল বৌঠান, সন্তোষ মজুমদার মশায়ের স্ত্রী শৈল বৌঠান, কালীমোহনবাবুর স্ত্রী মনোরমাদি প্রভৃতি যে কয়জন মহিলা তখন আশ্রমে ছিলেন সকলেই এসেছিলেন সেই রাত্রে আশ্রমের নূতন অধিবাসিনীকে সমাদর করে ডেকে নিতে। ...গুরুদেব ছিলেন কলকাতায়। ঐ সময় তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্যার উপাধি বর্জন করে লাটসাহেবকে পত্র দেন।"

... "বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপন উৎসব হয় ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে — পৌষমেলার মধ্যে — ৮ই পৌষ। এই উৎসব উপলক্ষে কবিগুরু নূতন একটা গান লেখেন 'পাখী আমার

নীড়ের পাখী'। এই গানটি আর ক'টি গান 'কূল থেকে মোর গানের তরী', 'মাটীর প্রদীপখানি আছে মাটীর ঘরের কোলে', 'তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন' — ইত্যাদি শুনতাম প্রায়ই আশ্রম বালিকাদের মুখে ······ দিনুবাবুর ঘরে বসতো গানের আসর, ছুটীর দিনে, মেঘলা দিনে, কারণে অকারণে। গান শেখাতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না।" — সুধাময়ী দেবীর দীর্ঘ ৬৩ বছরের বিবাহিত জীবনে এই গানগুলিই স্থান পেয়েছিল তাঁর পছন্দসই গানের তালিকার শীর্ষে।

১৯১৯ এর জুলাই থেকে বিশ্বভারতীর কিছু কিছু ক্লাশ শুরু হয়। প্রথম ছাত্রছাত্রী হলেন আশ্রম বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও তাঁদের পত্নীরা। সেই দলে সুধাময়ীও যোগ দিয়েছিলেন। তিনি লিখছেন "মহা উৎসাহে আমরা ক্লাশে যেতে লাগলাম। সকালে কোনদিন বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়ের কাছে ভারতীয় দর্শন, কোনদিন কপিলেশ্বর মিশ্র মশায়ের কাছে পড়তাম পাণিনি ব্যাকরণ, দুপুরে এণ্ডরুজ সাহেবের কাছে ইংরাজী সাহিত্য আর সন্ধ্যায় গুরুদেবের কাছে বিবিধ সাহিত্য। নকুলেশ্বর গোস্বামীর কাছে মার্গ সঙ্গীতের হাতেখড়িও হয়েছিল।

"যাতে অধ্যাপকরাও বিদ্যাচর্চা করেন অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে, তারজন্য গুরুদেব উৎসাহিত করতেন সকলকে। বিদেশী পত্রিকা থেকে নিজে বেছে নিতেন অধ্যাপকদেরকে অনুবাদ করে কোন বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ করতে দেবার জন্য। বিদেশী গল্প থেকে ছোটদের জন্য তখন কয়েকটি গল্প অনুবাদ করেছিলাম আমি। সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে দেখতে দিয়েছিলাম। যখন ফেরত দিলেন দেখি আমার লেখার পাশে পাশে তাঁর হাতের লেখা — প্রায় দু-পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। গল্প লেখার কায়দাটি দিয়েছেন দেখিয়ে।" — পরবর্তী জীবনে (জীবনের শেষভাগে) সুধাময়ী দেবী গুরুদেবের 'গীতবিতানে'র বহু গান বাংলা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন অতি সাবলীলভাবে।

এরপর তিনি লিখছেন "আমি তখন সবে এসেছি 'শান্তিনিকেতনে' — মহিলা সমিতির (আলাপিনীর) অধিবেশন হচ্ছে পুরানো ছাত্রদের জন্য যে খড়ের চালের মাটীর ঘরখানা ছিল সেখানে। আমি মিলেছি নবীনাদের সঙ্গে, এঁদের মধ্যে আছেন প্রতিমাদেবী, মীরাদেবী, কমলাদেবী, শৈলদেবী, কিরণদি, ননীবালাদি, মনোরমাদি। এঁদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠা যাঁরা তাঁরা হলেন — বড়মা হেমলতাদি, সন্তোষ মজুমদার মশায়ের স্ত্রী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের স্ত্রী। আবার আশ্রম বালিকারাও আছে — নুটু (রমা), রেখা, রাণু, পারুল, মঞ্জু, জয়া। সমিতিতে সেদিন হল গান, আবৃত্তি আর ছোটরা ঐ ঘরেই পর্দা টাঙ্গিয়ে করল অভিনয় — 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', —সমিতিতে হত সাহিত্যচর্চা, শিল্পচর্চা নানারকমের।

শুধু ছোটরাই যে এখানে অভিনয় করতো তা নয়; বড়রাও করতেন মাঝে মাঝে। শকুন্তলা নাটকের মূক অভিনয় হয়েছিল একবার। তাতে কিরণদি সেজেছিলেন কণ্বমুনি, নন্দলালবাবুর স্ত্রী সুধীরাদি হন দুষ্মন্ত, আমার ননদ কাত্যায়নী (যাদবপুরের হীরালাল রায়ের স্ত্রী) শকুন্তলা। আর একবার বড় মেয়েরা করেন এক মূক অভিনয়ের আয়োজন। এক একটি দৃশ্যে তাঁরা সেজেছিলেন এক একটি নামকরা নাটক বা উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকা। দর্শক অবশ্য তখন সব মেয়েরাই। দর্শকদের বলতে হচ্ছিল — কোন উপন্যাসের ঐ দৃশ্য যেমন, 'চোখের বালি', 'গোরা' ইত্যাদি। ……… সমিতি থেকে বার হত একটি পত্রিকা — 'শ্রেয়সী'। …… 'আলাপিনী সমিতি'র সভ্যরা যেতেন শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি গ্রাম — গোয়ালপাড়া, সুরুল, বাঁধগোড়া, ভুবনডাঙ্গা, সুপুর, রায়পুরে। সে সব গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে হত শিল্পচর্চা, শিশুমঙ্গল সভা। একবার গ্রামের মেয়েদের ডেকে শান্তিনিকেতন সিংহসদনে হয় মেয়েদের এক সভা। কবিগুরু এই সভায় কিছু বলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা করে কবির নাটক 'বশীকরণ' অভিনয়।

"আলাপিনী মহিলা সমিতির সহকারী সম্পাদিকারূপে আমি থাকি ১৯৩৩ সন থেকে ১৯৩৫ পর্য্যন্ত। প্রতিমাদেবী ছিলেন সম্পাদিকা। তখন কিছুদিন এই সমিতির সঙ্গে যোগ ছিল 'নিখিল ভারত নারী সমিতি'র (A.I.W.C) রেণুকা রায় আসতেন মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে। …… তবে এ যোগরক্ষা করা সম্ভব হয়নি বেশী দিন। প্রতিমাদেবীকে নিতে হয় বিশ্বভারতীর বহুবিধ কর্তব্যের ভার। ১৯৩৫ এ আমি চলে আসি আর এক কাজের ভার নিয়ে শান্তিনিকেতের বাইরে। বোলপুর মেয়ে স্কুলের ভার আমি নিই ১৯৩৫ এ ডিসেম্বর থেকে।

"'আলাপিনী সমিতি' কিছুকাল বন্ধ থাকার পর ১৯৪৩ সন থেকে পূজনীয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর নেতৃত্বে তা পুনরুজ্জীবিত হয়। সে সময় আমি আছি বোলপুরে মেয়েস্কুলের কাজে। বোলপুর সহরবাসীদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনবাসীদের যোগাযোগ খুব অল্পই ছিল আগে। ক্রমে সেই যোগাযোগ হতে থাকে প্রশস্ত নানা দিক দিয়ে। 'আলাপিনী মহিলা সমিতি'র অধিবেশনে বোলপুর থেকে মহিলারা যেতে পারতেন না নিয়মিত। তাই বোলপুরের মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয় আর একটা মহিলা সমিতি। সেখানে প্রায় সম্পাদিকার কাজ করতে হয় আমাকে। আমার প্রধান সহায়ক হন বোলপুরের হংসেশ্বর রায় মশায়ের স্ত্রী পঙ্কজিনী রায়। আমরা যেতাম মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন আলাপিনী সমিতির কোনো বিশেষ অধিবেশনে।" —'আলাপিনী সমিতি' থেকে 'ঘরোয়া' নাম দিয়ে একটি পত্রিকা বার হয় ১৯৫৭ সালে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর প্রচেষ্টায়। সুধাময়ী দেবীকে নির্বাচিত করা হয় এর সম্পাদিকা। 'ঘরোয়া' চলে প্রায় চার বছর (১৯৫৭—১৯৬০)।

'আলাপিনী মহিলা সমিতি' ছাড়াও শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট যোগ ছিল। প্রথমে আশ্রমে এসে (১৯১৯) আশ্রম বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের কিছু পড়াবার ভার নেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই নিবিড় ছিল। প্রায়ই তারা খেতে বা গল্প শুনতে যেতো তাঁর বাসায়। ক্রমে সংসারের কলেবর বাড়তে লাগল — আর বাইরের জীবনের স্রোতেও পড়ল ভাঁটা। তারপর আবার কতকটা প্রয়োজনেই তিনি শান্তিনিকেতন পাঠভবনের কাজে (১৯৩৩) যোগ দিলেন আংশিকভাবে। এই সময়ের কথায় মা লিখছেন—"তখন বিশ্বভারতীতে শ্রীসদনের (মেয়ে হোস্টেলের) ভার নিয়ে আছেন হেমবালা সেন। ... বারো বছর শ্রীসদনের কাজে থাকার পর তিনি অবসর নেন ১৯৩৪ সনে। তখন তাঁর স্থানে কাজ করার যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনে কিছু সময় লেগেছিল আশ্রমের কর্তৃপক্ষের। আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা-দেশীয় বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রীদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করা, তাদের পরিচালনা করার দক্ষতা অর্জন সহজসাধ্য নয়। তাই এই নির্বাচন সমস্যা কিছুটা ভাবিয়ে তুলেছিল কবিগুরুকে।

"১৯৩৫ সনের সেপ্টেম্বরে এক সন্ধ্যায় উত্তরায়ণ থেকে এক ভৃত্য এলো আমাদের গুরুপল্লীর কুটীরে — বললো যে 'বাবুমশায় ডেকেছেন আপনাদের দুজনেরে।' বিস্মিত হলাম, কী প্রয়োজনে তাঁর এই আহ্বান। দ্বিধাগ্রস্ত মনে গেলাম তাঁর কাছে। দেখি একা বসে আছেন কোণার্কের চত্বরে। প্রণাম করে বসে আছি নীরবে তিনি কি বলেন শোনার প্রতীক্ষায়। ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন তিনি — 'সুধা, তুমি কি এখানকার মেয়ে হোস্টেলের ভার নিতে পারবে?' আমার দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করে আবার বলে চললেন 'তোমার সংসার ফেলে থাকা সম্ভব নয়, জানি। তাই রাত্রে মেয়েদের কাছে থাকবার জন্য তোমার একজন সহকারিণীর সন্ধান করতে হবে।'

"আমি সঙ্কুচিতভাবে বল্লাম, 'যদি আপনি মনে করেন একাজ আমার দ্বারা সম্ভব তবে আমি নিতে পারি।'

"একথা শুনে তিনি ধীরে ধীরে বলে চললেন 'সম্ভব নয় কেন? একাজে যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হল সবরকম লোকের সঙ্গে মেশার ক্ষমতা। শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় একটি আত্মকেন্দ্রিক ভাব। নানাস্তরের লোকের সঙ্গে মিশতে পারে না তেমন করে। বরং তথাকথিত শিক্ষার সুযোগ যারা পায়নি, তেমন মেয়েদের মধ্যে অনেকে মিশতে পারে পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে। মেলামেশার বাধা সৃষ্টি করে যে আত্মকেন্দ্রিকতা, তা সরিয়ে ফেলার সাধনা চাই বিশেষ করে শিক্ষিতা মেয়েদের। আমাদের এখানে মেয়ে হোস্টেলে আসে নানা জায়গা থেকে নানারকমের মেয়ে, প্রকৃতি তাদের নানারকম। এদের

সঙ্গে ব্যবহারে চাই অসীম ধৈর্য, অবাধ উন্মুক্ত মনের প্রসার — আবার দৃঢ়চিত্ততা — যাতে তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায়। যার সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করলে সংঘর্ষ এড়িয়ে পরিচালনার কাজ সুগম হয় — সেই বিচক্ষণতার বিশেষ প্রয়োজন।' অনেকক্ষণ তিনি বলে গেলেন আপনমনে। এত কাছে থেকে তাঁর কথা শোনার সুযোগ যে পেলাম — তাতে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। কবিগুরুর অতি সান্নিধ্য লাভ করার স্পর্ধা গ্রহণ করতে বরাবর আমি সঙ্কোচবোধ করেছি। নীরবে তাঁর আলাপ আলোচনা শুনেছি সকলের মধ্যে বসে এককোণে; প্রয়োজন মত তাঁর আদর্শে আশ্রমের সেবা করে যেতে চেয়েছি।

"শান্তিনিকেতন মেয়ে হোস্টেলের কাজ আমাকে নিতে হয়নি। সেখানে কাজে এলেন একজন ফরাসী মহিলা মাদামোয়াজেল বস্‌নেক। হোস্টেল পরিচালনার কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল যথেষ্ট। তবে তিনি ইংরাজীতে বা বাংলাতে কথোপকথনে অভ্যস্থ ছিলেন না। তাই গুরুদেবের নির্দেশে প্রতিমাদেবীর অনুরোধে একমাসকাল মিস্ বস্‌নেকের সঙ্গে ছাত্রীদের কথোপকথনের সুবিধা করে দেবার ভার নিতে হল আমায়। রোজ সকালে ভুবন-ডাঙ্গা থেকে যেতাম হোস্টেলে কিছুক্ষণের জন্য এই কাজে। এমনি করে মিস্ বস্‌নেকের কাজের ধারা লক্ষ্য করার সুযোগ হল আমার। হাসিমুখে কীভাবে ছাত্রীদের শৃঙ্খলার সঙ্গে চলাফেরা, কাজ করার অভ্যাস করান যায় — তা তাঁর কাজের প্রণালী দেখে বুঝলাম।"

এরপর দেখা যায় সুধাময়ী দেবী কীভাবে ১৯৩৫ থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বোলপুরের মেয়েদের স্কুল বা পাঠশালাকে ক্রমে রূপান্তরিত করেন হাইস্কুলে ১৯৫০ সালে। তখন স্ত্রী-শিক্ষায়, স্ত্রী স্বাধীনতায় বোলপুর সহর পিছিয়ে ছিল বীরভূমের অন্যান্য সহরের মত। বোলপুরের সভাসমিতিতে মহিলাদের যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। সুধাময়ীদেবী তাই অনেক প্রতিকূল আবহাওয়ার সম্মুখীন হন এই বিদ্যালয় গড়ার কাজে। সহরে মেয়ে কি করে কাজ করতে পেরেছিলেন তা তাঁর ভাষাতেই বলি "গুরুদেবের উপদেশবাণী অজ্ঞাতে কাজ করেছিল মনের উপর নিশ্চয়, তা না হ'লে পাঠশালার কাজে ঢুকতে মন বিমুখ হত কিনা কে জানে। গ্রাম ও ছোট সহরের অর্ধশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে এসে মনের আনন্দে সংগঠনের কাজে লেগে গেলাম। নিন্দা প্রশংসার উজান বেয়ে চললাম ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে এই ধ্রুবতারা হলো গুরুদেবের বাণী ও জীবন আর মাথার উপর বর্ষিত বাবা-মার আশীর্বাদ"।

প্রচ্ছদের নামাক্ষর 'শ্রেয়সী' এবং সপ্তপর্ণী চিত্র, পুরাতন 'শ্রেয়সী' এবং 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।
চিত্র এবং মলাট মুদ্রণ : দি রেডিয়েন্ট প্রসেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড। কলিকাতা-১৩

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

A Glimpse of the Past

By KEDARNATH CHATTERJI

It was the autumn of 1913. Summer vacations were nearly over and there was quite a group of us who had gathered together in London, waiting for the opening of our Colleges. Rabindranath had returned to England in May that year, after his lecture tour in the United States. He had delivered six lectures in six weeks after his return, at the Caxton Hall in London, and then had gone into a nursing home for a month, for medical treatment, which involved a minor operation. After that was over he had come to a friend's house on the Cheyne Walk in Chelsea, for a brief stay before he sailed for India.

The Poet had come to England in the June of 1912, and had stayed, in London mostly, till about the end of October, when he went to the U.S.A. The translations of his poems, made by the Poet himself, had been received with enthusiasm by a literary group, and Yeats had given readings from a collection of those, which were published in the November of that year as The *Gitanjali,* by the India Society of London. It was during that period that Rabindranath's name had been sent on to the Nobel Prize Committee for an award in the Literature Section.

About a year later, towards the end of August, 1913, the news filtered through to London that the Nobel Committee had reached a decision on the award for Literature, and the recipient would be our Poet, Rabindranath Tagore. I do not clearly recollect how it came through to us, but I do remember Sukumar Ray almost dancing with joy while giving me the news, which we hastened to spread amongst our friends. We went on to Cheyne Walk to pay our respects to the Poet, whom we found quite calm and collected, as was usually the case with him, though it was soon evident that the news we had heard was correct, although the Poet did not want to talk about it. The official announcement, as a matter of fact, was made almost ten weeks later, when Rabindranath had gone back to India and his Santiniketan. We found that some journalists had come to Cheyne Walk in search of copy, and as Rabindranath was unwilling to be interviewed, they had gathered round Prasanta Mahalanobis, who was 'holding forth' with great aplomb to them, evidently much to the amusement of Sukumar Ray. We learnt that the passage had been booked for the return to India and that the Poet's party was due to sail about the first week of September.

About two or three days later, we went to Stuarts, the photographers, whose studio was in Knightsbridge, where a group photograph was taken with Rabindranath. William Rothenstein, whose earnest efforts were the prime agency through which the poetry of Rabindranath was placed before the European literary circles, was in the group. I do not remember whether Yeats had been asked to join us. Perhaps Rothenstein had thought it better not to request him, knowing the uncertain nature of Yeats' likes and dislikes of "modern" developments of all kinds. No one said anything about it, but all of us felt that his presence would have completed the picture.

Perhaps it would not be irrelevant if I added a few words here about Yeats, in this context, since I have mentioned his uncertain temperament. I cannot say that I "met" Yeats, for I was a callow youth, undergoing training in a College, whereas Yeats had already attained by then a prominent position in the forefront of English literary ranks. But I had been to his house and listened to him, on a few occasions. Indeed once I was thoroughly berated by him for having expressed disbelief in the occult powers of "mahatmas" and Yogis. Yeats seriously believed and had complete faith in ghosts, fairies, leprechauns—called "little people" by him—banshees and all that. He maintained that they were all present in their traditional habitat, only we, the "modern" humans, had been blinded by the glare of artificial lights and our

faculties had been dulled by the trammels of modern life to such an extent that we were unable to see them or to feel their presence. He would not have any gas or electrical appliances in his own apartments, as he had hopes of recovering the pristine keenness of the faculties with which he was born as an Irish baby.

I still remember the first occasion on which I saw him. I had gone to see Rothenstein—he became Sir William Rothenstein later—with Hiranmoy Roy Chaudhury. Rothenstein had heard that Yeats was back in town and was on his way to see him. He proposed that we should accompany him and we agreed gladly. Yeats answered the door-bell himself and then led the way upstairs with a candle held high over his head to light us up the stairs. There was neither gas nor electric lights in his living room, the only source of light being a tall three-branched candle-stand on the table. It was a chilly evening, but the only warmth was supplied by a dimly glowing log fire.

In the course of the conversation, Yeats said that he had gone to Ireland on that occasion, on a "fact finding" mission. It seems that some Irish paper had given the story of a party of primary school children, who had gone on a picnic excursion to a "Well" which was reputed to be frequented by the "little people". While the children and their teachers were resting after lunch, some children of the youngest group got up and went towards a clear patch of greensward, near the spring. They seemed very interested in something and some of them formed a loose circle and started dancing by fits and starts, as if under some one's direction. One of the teachers got up to see what was happening and on asking one of the children who were looking on as to what was going on, she was told that the others were dancing round "those funny little men" and were trying to copy their steps. The teacher naturally exclaimed loudly in surprise, and the others came rushing up. The children in the circle then stopped dancing saying that the little ones had run into the bushes surrounding the fairy green. In the narrative it was stated that only a few of the younger children were positive about seeing the "little people" and that they gave a clear description of their height, appearance, dress and dancing movements. The others did not see anything.

Some time later the same journal carried a letter from a Circus proprietor, who wrote that while his Circus was at a nearby town, a party from his troupe, which included several dwarfs, had visited the same well, and they were the "little people" that the school children had seen. Yeats had read both the accounts and had immediately set off to find the truth. He had returned fully convinced that the children

had seen the genuine "little people" and the Circus proprietor—whom he vehemently abused—had brazenly tried to gain free publicity for his troupe. On Rothenstein asking him how he could be so positive on that assumption, Yeats said he had traced out the school and the children who went on the picnic, and though they were very shy and afraid of being made fun of, two or three of them had admitted seeing the "little old men". And the description they gave of them, Yeats said, would not fit any dwarf that was ever born of a human mother.

That was Yeats all over, as I learnt later. But I am digressing, and must get back to the main track of my tale. In passing I would like to pay a tribute to the memory of William Rothenstein, artist, connoisseur, and a rare judge of literary merits. His chance discovery of the English rendition, by the poet himself, of a poem by Rabindranath, in a stray copy of the *Modern Review*—as related in his memoirs —and the closer acquaintance with Tagore in person that followed, was indeed a happy adventure for both, as subsequent events proved.

There is little more to tell. I came upon my copy of the group photo taken nearly half-a-century ago, while looking through some old papers. It brought back memories of days when the world seemed to us to be:—

> The land of faery,
> Where nobody gets old and godly and grave,
> Where nobody gets old and crafty and wise,
> Where nobody gets old and bitter of tongue.

—*The Land of Heart's Desire,* William Butler Yeats.

Some of those who were present that day have since passed behind the veil of eternity, but some of us are still present. It would be interesting perhaps, if I gave the names of those who were in that group. Those who were standing in the last row—from the left—were, Dr. Biman B. Dey (later of the I.E.S. in Madras), Narayan Kashinath Deval (artist), Hironmoy Ray Chaudhury (sculptor), Prasanta Chandra Mahalanobis (Director, Statistical Institute), a Punjabi gentleman, a Bengali Barrister, another Bengali Barrister and lastly Apurva Kumar Chanda, I.E.S. (retd.). Seated in the middle row were, Sukumar Ray (whose children's stories and poems are classics now), William Rothenstein, Rabindranath Tagore, Satish Roy (late D.P.I. in Assam) and Kalimohan Ghosh of Surul, Santiniketan. In the foreground, Kedarnath Chatterji and Arabindo Mohan Bose.

“কবিতায় বা গানে ফিরে-ফিরেই একজন বিদেশিনীর কথা বলেন রবীন্দ্রনাথ, বলেন এক অপরিচিতার নাম, যে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে দূরতম কোনো সুন্দরের দিকে। ‘সোনার তরী’ বা ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’র নৌকোটিতেই যে এর প্রথম দেখা মিলল তা নয়, চেনা-অচেনার জড়ানো রহস্য নিয়ে অনেককাল ধরেই এর উষ্ণতা অনুভব করছিলেন কবি। হয়তো-বা নাম ছিল ভিন্ন, হয়তো-বা প্রকাশের ভঙ্গি ছিল ভিন্ন। হয়তো কখনো পৃথিবীর প্রতিবেশিনীর মেয়ে হয়ে দেখা দেয় সে, অথবা কখনো জগতের নদীগিরি সকলের শেষে সে এক বিরহিণী প্রিয়া, আবার কখনো সে এই বিপুল বিশ্বলোকের এক প্রতিধ্বনি মাত্র, অনতিগোচর অনতিশ্রুত কোনো প্রতিধ্বনি। আমরা জানি যে এই প্রতিধ্বনিকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে তাঁর রচনাপাঠ শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়।”

বিদেশিনী - ওকাম্পো’র রবীন্দ্রনাথ - শঙ্খ ঘোষ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

স্ত্রী বিয়োগঃ অশ্রুসিক্ত কবিতার জন্মঃ রবীন্দ্রনাথ

উনতিরিশও হয়নি মৃণালিনীদেবী মারা যান। আদরের সম্বোধনে কবি যাঁকে 'ছুটি' বলে চিঠি লিখতেন দূরে গেলে।

সেই ছুটি যখন সত্যিই ছুটি নিলেন; চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন একচল্লিশ। স্বীয় স্ত্রী বিয়োগে কত কবি মনীষী মহাত্মাই তো শোকবিহ্বল হয়েছেন, বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করতে না পেরে অশ্রুবিসর্জন করেছেন প্রকাশ্যে অথবা নিভৃতে সংগোপনে।

সেই যে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন না, কথাটা এই মুহূর্তে মনে পড়ল। 'স্ত্রীবিসর্জন মাত্রই ক্লেশকর – মর্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জন করে, তাহারই হৃদয়োদ্ভেদ হয়। ... ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে, পত্নী বিসর্জন তাহার পক্ষে কী ভয়ানক দুর্ঘটনা।'

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিদগ্ধ প্রাজ্ঞ মহাপণ্ডিত। তাঁরও স্ত্রীর মৃত্যুতে বুকের ভেতরটা গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।

পত্নীবিয়োগের মাস দুই পরে এক স্মরণ পুস্তিকায় ভাষাচার্য লেখেন, 'ভরাভর্তি সংসার রেখে সে বিদায় নিয়েছে। আহা সে এক গভীর প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে আছে – মুখে যন্ত্রণার কোনও ছাপ নেই। তাকে সবাই মিলে বধূবেশে সাজিয়ে দিয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে আছি – আর বুকের ভেতরটা আমার গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সব শেষে সব ভস্মীভূত। আমি বিড়বিড় করে আপন মনে বলতে লাগলাম – অনুপম, মৃত্যুর সৌন্দর্যে সে যেন আরও সুন্দর।'

স্ত্রীবিয়োগে সারদামঙ্গল-এর কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কান্নাও খুবই মর্মস্পর্শী।

হা হা রে হৃদয়-ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার।
উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হায়,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল মাথায় ...
প্রণয়-পরীক্ষা হেতু করিয়ে ছলনা,
সরলা লুকায়ে বুঝি দিতেছ যাতনা ?
অয়ি প্রিয়ে, দেখা দাও, পরাণ জুড়াও,
বৃথা কেন লুকাইয়ে আমারে কাঁদাও?
পরাণ কাঁদিয়ে ওঠে না দেখে তোমারে
তোমা বই কে আমার আছে এ সংসারে।

কবির প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে এই শোক। চোখের জল শুকোতে না শুকোতে অবশ্য বিহারীলালকে দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধ হতে হয়।

আর পত্নীবিয়োগে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যিনি রেকর্ড করেছিলেন তাঁর নাম চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। স্ত্রীর মৃত্যুতে যিনি অসামান্য গদ্যকাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যের উদ্যানে তাজমহল সৃষ্টি করে গেছেন তিনি উদ্ভ্রান্ত প্রেম গদ্যকাব্যের রচয়িতা চন্দ্রশেখর। এই বইয়ের একটা অধ্যায় বঙ্কিম তার বঙ্গদর্শনে ছাপিয়ে ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই লেখক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'তিনি বাঙ্গালার একটি মোহিনীময় রচনাপ্রণালীর জন্মদাতা, তাহার লিখিত উদ্ভ্রান্ত প্রেম বহুকালাবধি বঙ্গীয় যুবকদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিবে।'

সেই বিগত প্রেমের হাহাকারের একটু নমুনা কি চাই ?

'হায় ! এমন করিয়া আর কত দিন পুড়িব ? কত দিনে এ যন্ত্রণা ফুরাইবে ? আর কখন কি তোমায় পাইব না ? ... হায়! কেন মরিলাম না ? চক্ষে ধূলা দিয়া সে যখন পলাইল, কেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম না ? যখন মৃত্যুর বিকট ছায়া সেই মুখে লাগিল, তখন, কেন গরল খাইলাম না ? সেই যে চিতা, নৈশান্ধকার দগ্ধ করিয়া, ভাগীরথী সৈকত আলো করিয়া জ্বলিয়াছিল, কেন তাহাতে শুইলাম না?'

ইনি এই প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ এবং অতঃপর আবারও বিবাহ করেছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোকগাথাও কবিকে অমর করে গেছে। এই প্রসঙ্গে মানকুমারী বসুর দু'টি কবিতার ছত্র মনে পড়ে:

মোর – আঠারো বছর বেলা,
খেলি পাষণ্ডের খেলা
পতি কেড়ে নিলে,
অনায়াসে, উদাসীনা
বিশ্বে হতভাগী, দীনা,
সাজাইয়া দিলে।

কিংবা প্রয়াত স্বামীকে স্মরণ করে মহিলা কবি লিখছেন:

উঠ দেবতা আমার
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে (বুঝি গত জন্মান্তরে)
আজি আসিয়াছে দাসী চরণে তোমার;
কমল-আনন তুলি কমল নয়ন খুলি
অভাগারে কাছে ডাক আর একবার
হায় দেবতা আমার।

'শুভম সাময়িকী'-র প্রতিটি সংখ্যায় সুনীল সম্পর্কে স্বাতীর লেখাগুলি পড়লে চোখে জল আসে। জীবনে এমন অনেক শোক আছে যার কোনও সান্ত্বনা নেই।

শোকের পরিমাপ করার কি যন্ত্র আছে পৃথিবীতে ? আমার ঠিক জানা নেই। তবে সাহিত্যের শোকগাথা থেকে কবিদের শোকানুভূতির খবর মেলে। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ স্ত্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত একগুচ্ছ কবিতার সংকলন। এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়েই পরিমাপ করতে চেষ্টা করব স্ত্রীবিয়োগ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কতখানি

ক্লেশকর মর্মভেদী হয়েছিল, স্ত্রীবিসর্জন তার হৃদয়োদ্ভেদ কতখানি তীব্র, কত ভয়ানক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যের রসবিচার করা এই প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য নয়। এই কবিতাগুলির চরণ স্পর্শ করে আমি মৃণালিনী দেবীকে খুঁজতে চাই, মৃণালিনী দেবীর স্বামীকে দেখতে চাই, আর মৃণালিনী-রবীন্দ্রের দাম্পত্যের স্বরূপটাও একবার বুঝে নিতে চাই। স্ত্রীবিচ্ছেদক্লেশে পীড়িত স্বামীদের বঙ্কিম দু'টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এক শ্রেণির স্বামী – যারা স্ত্রীকে ভালো বাসুক বা না বাসুক পর্যায়ে পড়ে; আর অন্য একটি শ্রেণি – যে স্বামী তার স্ত্রীকে সত্যিই গভীর ভাবে অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই দুই শ্রেণির স্বামীর মধ্যে কোন পর্যায়ে পড়েন? যে-বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলছি তিনি নিজেও তো এক দশকের দাম্পত্যজীবন সাঙ্গ করে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছ'মাস যেতে না যেতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

আমাদের প্রশ্ন, স্ত্রীকে ভালোবাসায়, ভবতারিণীকে ভালোবাসায়, মৃণালিনীকে ভালোবাসায়, ভাই ছুটিকে ভালোবাসায়, ঠাকুরবাড়ির ভাই ছোটবউকে ভালোবাসায়, ভাই ছোটগিন্নিকে ভালোবাসায় রবীন্দ্রনাথের নিজের দিক থেকে কি কোনও অপূর্ণতার অনুশোচনা ছিল? কোনও আক্ষেপ? যে-ভালোবাসা তিনি স্ত্রীকে দিতে চেয়েছিলেন দিতে পারেননি? কিংবা দেওয়া হয়ে ওঠেনি? হয়তো দাম্পত্যজীবনের দৈনন্দিনতায় তা সবসময় অনুভূতও হয় না – নিজের বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে নিরন্তর অভিভূত থেকে গৃহকোণের এই সামান্য কথাটিতেই উদাসীনতা থেকে যায় – একটু ভাববার মতো সময়ও বুঝি থাকে না। উনিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে পাঁচটি সন্তানেরও জনক হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মৃণালিনীর কোল জুড়ে একে একে এসেছে বেলা রথী রানি মীরা শমী। একদিকে ঘরে সংসার বেড়েছে, আর-একদিকে নিজের সাধনায় এবং বাইরের কর্মযজ্ঞে গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে ক্রমেই কবি আত্মনিমগ্ন হয়েছেন। মৃণালিনী যে তাঁর পুত্র-কন্যাদের শুধু জননীই নন, মৃণালিনী যে কবির একান্ত অর্ধাঙ্গিনীও – সে-কথাটা বুঝি কবির তেমন ভাবে মনে পড়েনি গত দুই দশকে। স্ত্রীর চলে যাওয়ার পরেই বুঝি স্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে খুঁজে পেয়েছিলেন, আবিষ্কার করেছিলেন। আমার নিজের কোনও কথা নয়, স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা দিয়েই কবির দাম্পত্যজীবনের সম্পর্কের ইতিহাসটি পুনর্নির্মাণ করতে চাই। স্মরণ-এর কবিতাগুলিই এখানে আমার একমাত্র অবলম্বন।

১৩০৯-এর ৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর ১৯০২-এ কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী মারা যান। ওই অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শন-এই মৃণালিনীকে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের ছয়টি শোকগাথা প্রকাশিত হয়। প্রতীক্ষা, শেষ কথা, প্রার্থনা, আহ্বান, পরিচয় এবং মিলন। মিলন-এর প্রথম দু'টি ছত্রে কবি বলেছেন, 'মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা-সনে/এ বিচ্ছেদবেদনার নিবিড় বন্ধনে।'

এই কবিতার শেষাংশটুকু থেকে মৃণালিনীর জীবনের অন্তিম মুহূর্তটি খুঁজে পাওয়া যায়। যিনি স্বামীকে ছেড়ে চলে যান তাঁরও বুঝি ইচ্ছে হয় শেষ মুহূর্তে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলে যাই – দু'টি কথা একটি কথা। আর যে-স্বামী মৃত্যুমুখী স্ত্রীর মুখপানে চেয়ে রয়েছেন তারও ইচ্ছে করে স্ত্রীর মুখের শেষ কথাটুকু শুনে নিতে।

না, সেই শেষ রাতে চলে যাবার আগে কিছু বলে যাবার অবকাশ মৃণালিনীর হয়নি। নীরবে সিক্ত-নয়নে রোগকাতর মৃণালিনী কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কবি বলছেন, 'দুজনের কথা দোঁহে শেষ করি লব/সে রাত্রে ঘটেনি হেন অবকাশ তব/বাণীহীন বিদায়ের শেষ বেদনায়/চারি দিকে চাহিয়াছি ব্যর্থ বাসনায়।/আজি এ হৃদয়ে সর্ব ভাবনার নীচে/তোমার আমার বাণী একত্রে মিলিছে।'

মৃণালিনীর কথা বলার কোনও ক্ষমতা ছিল না শেষ সময়ে। মধ্যরাত্রে তিনি মারা যান। সেই নিশীথরাত্রে কবিপত্নীর পাশে শুধুই একাকী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ – কবির ইচ্ছাতেই। ষোলো বছরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্র মায়ের মৃত্যুর আগের দিন মাকে দেখতে এলেন বিকেলে। 'মৃত্যুর আগের দিন বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যাপার্শ্বে তাঁর কাছে বসতে বললেন। তখন তাঁর বাক্ রোধ হয়েছে। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রুধারা বইতে লাগল। মায়ের সঙ্গে

আমার সেই শেষ দেখা। আমাদের ভাইবোনদের সকলকে সে রাত্রে বাবা পুরানো বাড়ির তেতলায় শুতে পাঠিয়ে দিলেন। একটি অনির্দিষ্ট আশঙ্কার মধ্যে আমাদের সারা রাত জেগে কাটল। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে বারান্দায় গিয়ে লালবাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা নিস্তব্ধ, নিঝুম; কোনও সাড়াশব্দ নেই সেখানে। আমরা তখনই বুঝতে পারলুম আমাদের মা আর নেই, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

কোনও কথা হল না পরস্পরে। নিবিড় নির্জন নিশীথে নীরবে স্ত্রীর বিদায় মুহূর্তটি রবীন্দ্রনাথ চোখের সামনে দেখলেন। মৃণালিনী চলে গেলেন।

১ মাঘ, ১৩০৯ তারিখেও স্মরণ-এর কবিতা লিখেছেন।

ঠিক আগের মাসে, ২ পৌষ তারিখে ছুটির কথা ভাবতে ভাবতে তাঁদের বিবাহের শুভমুহূর্তটির কথা মনে পড়ে। নববধূবেশে মৃণালিনীর এ-বাড়িতে আবির্ভাব মুহূর্তটি মনে পড়ে। জানতে কৌতূহল হয় (যদিও জানার উপায় নেই) শোককাতর রবীন্দ্রনাথ হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে 'তুমি কোথায়' বলে কী নামে ডাকতেন? ছোটবউ? ছুটি? মৃণালিনী? মৃণাল! কী জানি! মনে হয়, হয়তো, 'ছুটি তুমি কোথায়' এই নীরব আর্তনাদে বুকভাঙা বেদনায় কবি গোপনে হাহাকার করতেন। বিয়োগমুহূর্তে কান্না গোপন রাখতে পারবেন না বলেই কি রথীদের অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে একা স্ত্রীর পাশটিতে ছিলেন? অন্তত একবারটি গোপনে স্ত্রীর বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়তে চেয়েছিলেন? চোখের জল শাসন মানে না – এ-কথা রবীন্দ্রনাথ জানবেন না তো কে জানবে?

স্বসম্পাদিত মাসিক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১৩০৯ অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফালগুন সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচিত শোকগাথাগুলি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে অগ্রহায়ণে যে-ছয়টি কবিতা মুদ্রিত হয়, তাতে রচনার তারিখ নেই। পরবর্তী সংখ্যায় মুদ্রিত কবিতাগুলিতে রচনার তারিখের উল্লেখ আছে।

মৃণালিনীর অগ্রহায়ণে মৃত্যু, বঙ্গদর্শনের অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই শোকগাথার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত। এমন হতে পারে – মৃত্যুর দিনেই, অথবা তার পরের দিনেই কবি কোনও কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার নীচে ৭ অগ্রহায়ণ বা ৮ অগ্রহায়ণ হয়তো কবি নিজেই লিখতে চাননি। তবে অগ্রহায়ণ সংখ্যার একটি-দু'টি কবিতা স্ত্রীর মৃত্যুর দু-একদিনের মধ্যেই লেখা বলে মনে হয়। 'শেষ কথা' কবিতায় কবি লিখেছেন: 'তখন নিশীথরাত্রি; গেলে ঘর হতে/যে পথ চল নি কভু সে অজানা পথে।/যাবার বেলায়। কোনো বলিলে না কথা,/লইয়া গেলে না কোনো বিদায়বারতা।'

কবিতার মাঝে বলছেন: 'গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্তহাতে?/এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে?/বিশ বৎসরের তব সুখদুঃখভার/ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার!'

আর একেবারে শেষ স্তবকে বলছেন: 'তোমার সংসার-মাঝে হয়, তোমা-হীন/এখনো আসিবে কত সুদিন-দুর্দিন –/তখন এ শূন্য হতে চিরাভ্যাসটানে/তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে?'

ওই অগ্রহায়ণে মুদ্রিত 'প্রার্থনা' আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই/যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।'

কবিতার শেষে সদ্য-লোকান্তরিতা স্ত্রীর প্রতি কবির প্রশ্ন: 'আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে –/হে কল্যাণী, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,/মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে/রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা-তরে?'

এই ব্যাকুল-বিহ্বলতা তাৎক্ষণিক শোকের প্রতিক্রিয়ার ফসল বলাই বাহুল্য।

হেমন্ত শেষ হয়, শীত চলে যায়, ফাল্গুনে নবীন বসন্ত এসে দেখা দেয়। কবি সেই বসন্তকে আহ্বান করে 'উৎসব' কবিতায় (বঙ্গদর্শন/১৩০৯, ফাল্গুন) বলেন: 'এসো বসন্ত, এসো আজ তুমি/আমারো দুয়ারে এসো। .../আমার ঘরের শ্রীহীন মলিন/দীনতা দেখিয়া হেসো।/তবু বসন্ত, তবু আজ তুমি/আমারো দুয়ারে এসো।'

শোকগাথার কোনও কোনও কবিতায় সংসারে স্ত্রীর কুণ্ঠিত লজ্জানম্র গৃহকর্মনিমগ্ন আত্মপ্রকাশবিমুখ নারীরূপটিকে পাই।

'পরিচয়' কবিতায় বলছেন: 'যত দিন কাছে ছিলে, বলো, কী উপায়ে/আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে।/ছিলে তুমি আপনার কর্মের পশ্চাতে/অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে।'

স্ত্রীর কুণ্ঠিত লজ্জিত মূর্তিটি 'কথা' কবিতাতেও ধরা পড়ে।

'তোমার সকল কথা বল নাই, পার নি বলিতে –/আপনারে খর্ব করি রেখেছিলে তুমি, হে লজ্জিতে, /যতদিন ছিলে হেথা। হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি –/যখন চাহিত তারা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি,/তর্জনী-ইঙ্গিতে তুমি গোপনে করিতে সাবধান/ব্যাকূল সংকোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান।'

এইসব কবিতার মধ্যে কবির কিছুটা গ্লানিবোধের ইঙ্গিত মেলে। সেই স্বাধীনতা, সেই মুক্তি, সেই আত্মপ্রকাশের যথাযথ মর্যাদা কি মৃণালিনী পাননি কবির সংসারে? পাননি যে তা তো সত্যই। অন্তত কবির তাৎক্ষণিক শোকবিহ্বল বিবৃতি সেই প্রমাণই দেয়।

কুড়ি বছরের দাম্পত্যজীবন। কবির বয়স বাইশ থেকে বিয়াল্লিশ, মৃণালিনীর দশ থেকে তিরিশ। যৌবনের পূর্ণ সময় তাঁদের দাম্পত্যের সময়পর্বটি। হিসাবমতে আঠেরোটি বসন্ত তাঁরা অতিক্রম করেছিলেন তাঁদের দাম্পত্যজীবনে। কিন্তু তেমন ভাবে সত্যিই কি তাঁরা দু'জনে মিলে বসন্তের আহ্বানে সাড়া দিতে পেরেছিলেন?

না।

কবির স্বীকারোক্তি বলছে পারেননি। 'বসন্ত' কবিতায় সে-কথাটি তো খুব স্পষ্ট করেই বলা।

'পাগল বসন্তদিন কতবার অতিথির বেশে/তোমার আমার দ্বারে বীণা হাতে এসেছিল হেসে/লয়ে তার কত গীত, কত মন্ত্র মন-ভুলাবার –/জাদু করিবার কত পুষ্পপত্র-আয়োজনভার।/কুহুতানে হেঁকে গেছে, "খোলো ওগো, খোলো দ্বার খোলো।/কাজকর্ম ভোলো আজি, ভোলো বিশ্ব, আপনারে ভোলো।"/এসে এসে কতদিন চলে গেছে দ্বারে দিয়ে নাড়া –/ আমি ছিনু কোন্ কাজে, তুমি তারে দাও নাই সাড়া।'

কবিতার এই অংশটুকুই আমার প্রয়োজন। কবির এই স্বীকারোক্তিই বলছে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে সত্যিই বসন্তের আহ্বান ছিল না। আজ মৃত্যুর পর স্ত্রীকে যতই গৃহলক্ষ্মী কল্যাণী বলে সম্বোধন করি না কেন, দাম্পত্যের সেই নিবিড় আকর্ষণ ও বন্ধন না থাকলে কেমন করে সে-ঘর খুলে বসন্তের প্রবেশ ঘটবে? কবি এই কবিতায় নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন, আবার লোকান্তরিতা স্ত্রীর প্রতিও তাঁর অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।

যাইহোক, 'পূজা' কবিতায় নিজেকেই শুধু অপরাধ করে বলেছেন: 'আজিকে তুমি ঘুমাও, আমি জাগিয়া রব দুয়ারে,/রাখিব জ্বালি আলো।/তুমি তো ভালো বেসেছ, আজি একাকী শুধু আমারে/বাসিতে হবে ভালো। /আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,/তোমার লাগি আমি/এখন থেকে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুলরাজিতে/রাখিব দিনযামী।'

স্মরণ-এর কবিতাগুলি থেকে কবির বিগত দাম্পত্যজীবনের ছবি উদ্ধার করে তুলে আনা যায়।

সদ্য স্ত্রীবিয়োগকাতর কবির লেখা কবিতাতে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের যে ছবি উঠে আসে, তাতে কবিকে একশোতে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশি নম্বর দেওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, স্মরণ-এর প্রায় প্রতিটি কবিতার মধ্যেই যেন দু'টি ভাগ আছে। একটি ভাগে স্ত্রীর সঙ্গে কবির সম্পর্ক; আর অন্যভাগে আছে প্রয়াতা স্ত্রীর সঙ্গে কবির নূতন সম্পর্ক। সে-সম্পর্ক যেমন সুন্দর, তেমনই আকর্ষণীয়, তেমনই রোমান্টিক। মৃত স্ত্রীর প্রতি কবির সে কী গভীর রোদনভরা ব্যাকুল আকুতি। 'মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে/নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহমন্দিরে/নিঃশব্দ চরণপাতে।' মৃত্যুর পরে পুরাতন স্ত্রীকে 'নূতন বধূ' রূপে 'বিবাহমন্দিরে' কবি বরণ করলেন, সেখানে স্ত্রীকে তিনি 'প্রিয়া' বলে সম্বোধন করলেন। এই 'প্রিয়া'কে নিয়ে কবির যে-ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবনের কল্পনা – তা সত্যিই অসাধারণ এবং অসামান্য। 'সম্ভোগ' কবিতায় কবি বলছেন: 'আমার জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো –/তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো/যেন আমি বুঝি মনে/অতিশয় সংগোপনে/তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।/আমারি জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো।'

মৃত মৃণালিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-নূতন সম্পর্ক স্থাপন, তাতে রবীন্দ্রনাথকে স্বামী হিসেবে একশোয় একশো দিতে হয়।

প্রচেত গুপ্ত

যেমন খুশি রবীন্দ্রনাথ

পঁচিশে বৈশাখ যত আসে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। বুকের ভেতর ধুকপুক করে। গলা শুকিয়ে যায়। কপালে ঘাম জমে। মাথা বনবন করে। কানে কটকটানি হয়।

মনে পড়ে যায়, পঁচিশে বৈশাখ মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে ... ওরে বাবা!

এই পর্যন্ত শুনে সবাই নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছে। এর মানে কী! পঁচিশে বৈশাখ শুনে 'ওরে বাবা' বলবার কী হয়েছে? পঁচিশে বৈশাখ হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। একটা পবিত্র, স্নিগ্ধ, আনন্দ, গর্বের, ফুরফুরে দিন। সকাল থেকে সারাদিন ধরে রেডিয়োতে, টিভিতে, ট্রাফিকে, ফাংশনে, ভাষণে, শাসনে, অ্যাকশনে রবি ঠাকুরের গান চলে। ছেলেদের গায়ে পায়জামা, পাঞ্জাবি। মেয়েদের চওড়া পাড়ের শাড়ি। কপালে, হাতে বেলফুলের মালা। হাতে হাতে গীতবিতান, গীতাঞ্জলি। এর মধ্যে বুক ধুকপুক, মাথা বনবন, কান কটকটের কী হল!

নিশ্চয়ই চ্যাংড়ামি ধরনের কিছু ঘটেছে। আজকাল চ্যাংড়ামি গান, চ্যাংড়ামি লেখা, চ্যাংড়ামি কথা, চ্যাংড়ামি ভাবনা, চ্যাংড়ামি ভাষা, চ্যাংড়ামি সিনেমা, চ্যাংড়ামি থিয়েটার, চ্যাংড়ামি পলিটিক্স। চ্যাংড়ামি করে অনেকেই ভাবে, আহা, কী দিলাম! একেবারে স্যাটায়ারে ভরপুর। ব্যঙ্গে, রঙ্গে, বিভঙ্গে সমাজটাকে তরবারি দিয়ে একেবারে ফালাফালা করে দিলাম গো। আমার কীর্তিতে রাজনীতিবিদরা কুপোকাত, পণ্ডিতরা ধরাশায়ী, সমাজবিদদের ডিগবাজি। আমি হয়েছি সজনীকান্ত সেন! আমি হয়েছি শনিবারে চিঠি! আহা! আমার মতো প্রতিভাধর চ্যাংড়া সম্রাটকে যদি এই পৃথিবী কদিন আগে খুঁজে পেত, তাহলে সমাজের এই দুর্দশা হত না। হায় রে সমাজ! হায় রে পৃথিবী!

আমার এই পঁচিশ বৈশাখের ঘটনাও কি তাই?

না, আমার এই ঘটনায় চ্যাংড়ামির কোনও স্থান নেই। আমি সাগর। আমার দ্বারা চ্যাংড়ামির মতো কঠিন শিল্পকম্ম সম্ভব নয়। চেষ্টাও নেই। আমি কিছুই পারি না। অকর্মণ্য, অলস, বেকার। আমার কাছে রসবোধ খুব দামি একটা জিনিস। পরশপাথরের মতো। যোগ্য রসবোধ লোহাকে সোনা করে দিতে পারে। জীবন ও চার পাশের অ-মূল্যবানকে মূল্যবান করে তুলতে পারে। সাগরের মতো 'গুড ফর নাথিং' যুবক এই পরশপাথর পাবে কোথা থেকে? তাই আমি যা বলি তা সবই হাবিজাবি। তবে পঁচিশে বৈশাখের কান কটকট, মাথা বনবন হাবিজাবি নয়। সিরিয়াস। তাহলে এবার ঘটনাটা খুলে বলি। এটা আসলে একটা স্মৃতিকথা। ভয়ংকর স্মৃতি।

তখন যে পাড়ায় থাকতাম, সেখানকার মাতব্বর দাদা-দিদিরা এক পঁচিশে বৈশাখের আগে মিটিং ডাকল। বলল, 'এবার কবিগুরুর জন্মদিনে কিছু করতে হবে। শুধু গান, নাচ, আবৃত্তিতে আর চলবে না। চলবে না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন চলবে না?'

নান্টুদা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'বা রে, এক জিনিস বারবার ভালো লাগে? সবসময় যদি তোকে এক খাবার খেতে দেওয়া হয়, তুই খাবি? বল তুই খাবি?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'খাব না, তবে রবি ঠাকুরের গান বারবার শুনব।'

কেলোদা হাত তুলে বলল, 'ওসব বাদ দে। বেশি ইনটেলেকচুয়ালপনা দেখাস না সাগর। এবার একটা মজার কিছু চাই।'

আমি আরও অবাক হলাম। বললাম, 'রবিঠাকুরের জন্মদিনে মজা! ওঁর লেখা হাস্যকৌতুক অভিনয় করলে চলবে?'

জগাইবাবু রেগে গিয়ে বললেন, 'আবার সেই একই আমি লিখে দিতে পারি, ভদ্রলোক ওপর থেকে দেখে দেখে বোর হয়ে গেছেন ... নিজের মতো কিছু ভাব না ...।'

মাধবদা বলল, 'ঠিক! ঠিক! এবার পঁচিশে বৈশাখ, নতুন কিছু চাই। সামথিং নিউ। সামথিং ফান।'

আমি মিটিং থেকে মানে মানে কেটে পড়বার উপক্রম করলাম। সবাই মিলে আমাকে চেপে বসাল। নান্টুদা চোখ কটমট করে বলল, 'পালাচ্ছিস কোথায়? অ্যাঁ? তোকেই ভাবতে হবে। তোর কোনও কাজকম্ম নেই। সারাদিন ভাঙা তক্তাপোশে গড়াস। তুই এবারের পঁচিশে বৈশাখ নিয়ে একটা প্ল্যান দিবি। 'নান্টুদার কথায় সবাই ধমক দিয়ে উঠল।'

'ঠিক ঠিক, সাগরকেই বলতে হবে এবার পঁচিশে বৈশাখে কী করা যায়। নইলে ছাড়ব না।'

আমি বুঝলাম, একটা কিছু না বললে বিরাট বিপদ। এরা ছাড়বে না। যা আসে মাথায় বলতে হবে। হাবিজাবি যা খুশি। বলে পালাতে হবে। পাড়া ছাড়া হতে হবে যাকে বলে। কিন্তু কী বলব ? 'হে রবিঠাকুর ভগবান, মাথায় একটা পরিকল্পনা দাও। ধমকে, হুমকিতে, শাসানিতে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। বুকের ভেতর ধুকপুক করতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। সেই সঙ্গে মাথা বনবন, কান কটকট। বাপ রে! মুখ তুলে তাকাও ঠাকুর। মাথায় প্ল্যান দাও। আমি প্রাণ নিয়ে বাঁচি।

অতি সত্বর রবিঠাকুর মুখ তুলে তাকালেন। আমাকে পরিকল্পনা সাপ্লাই করলেন।

আমি মিটিঙের সবাইকে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ সাজলে কেমন হয় ? পাড়ার সবাইকে নিয়ে কম্পিটিশন হবে। অনেকটা গো অ্যাজ ইউ লাইকের মতো। যেমন খুশি সাজো। এখানে যেমন খুশির বদলে রবীন্দ্রনাথ সাজো। চলবে? কে কেমন রবীন্দ্রনাথ সাজে দেখা হবে। মজা হবে না? ফুটবল গ্রাউন্ডে বিকেলে সবাই সেজে আসবে। বালক রবি, কিশোর রবি, যুবক রবি, বৃদ্ধ রবি, ভাবুক রবি, লেখক রবি, প্রেমিক রবি যারা সাজবে তারা পাবে প্রাইজ।'

সবাই হইহই করে উঠল। আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি কেটে পড়লাম। তিনদিনের জন্য পাড়া ছাড়া। বন্ধু তমালের বাড়িতে শেল্টার নিলাম।

পরের ঘটনা আমার শোনা। 'যেমন খুশি রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে সেবার পঁচিশে বৈশাখ পাড়ায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। তুলকালাম কাণ্ড। উৎসাহের বান। সবাই 'রবীন্দ্রনাথ' হতে চায়। ছেলে, বুড়ো সবাই। সবাই ভাবল, এটা একটা বিরাট প্রেস্টিজের ব্যাপার হবে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি, মনন, চিন্তনের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ সাজো আর ফটাফট মোবাইলে ফোটো তুলে ফেসবুকে পোস্ট করো। সবাই হামলে পড়ল। বিকেলে ফুটবল মাঠে গিজগিজ করছেন রবীন্দ্রনাথ! রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ। মাস্টার, ছাত্র, চাকুরে, বেকার তো ছিলই, ছিল পুলিশ, নেতা, চোর, ডাকাত, লেখক, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, অভিনেতা, গায়ক, ধান্দাবাজ, অশিক্ষিত, মিথ্যুকরাও। ছিল ছাঁট কাপড়ের ব্যবসায়ী ঝুনঝুনওয়ালা, মেগা সিরিয়াল ব্যবসায়ী ভুরানা, গুল ব্যবসায়ী রামাহো। তারাও জোব্বা পরে দাড়ি লাগিয়ে হাজির। এক চিটিংবাজ সেজেছিল তরুণ বয়েসের রবি। উড়ু উড়ু দাড়ি। মায়ায় ভরা চোখ। কে যেন তাকে ঘাড় ধরে দু-ঘা দিল। যে মারল সেও রবিঠাকুর। চিটিংবাজ নাকি তার টাকা নিয়ে ফেরত দেয় না। ব্যস, দুই রবীন্দ্রনাথে শুরু হয়ে গেল মারপিট। নিমেষে বিরাট হুলুস্থুলু কাণ্ড। হইচই, চিৎকার, চ্যাঁচামেচি। পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে এল। কম্পিটিশন পণ্ড। মাঠে পড়ে রইল সাজা কবিগুরুদের চটি, দাড়ি, জোব্বা।

বড়ো সমস্যা হল, কেউ কেউ আজও কবিগুরুর সাজ ছাড়েনি। পঁচিশে বৈশাখ এলে আমি খুব সাবধানে থাকি।

সুরজিৎ রায়

সহজিয়া রবি

জোড়াসাঁকোর চার দেওয়ালের বৈভবের মধ্যে নয়, বিশ্বজোড়া খ্যাতির মঞ্চে নয়, বাউল গানের সরল সুরে যে মাটির গন্ধ আছে তার মধ্যেই এক অন্যরকম সৃষ্টির সুখ আছে, যেখানে তিনি সহজিয়া রবি। বাংলার লোকসংগীতগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাউলের ভাব, ভাষা ও সুর তাকে এতখানি মুগ্ধ করেছিল যে তিনি নিজেকে 'রবি বাউল' বলেও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন – "আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"

বাউল আধ্যাত্মপথের পথিক হলেও তাদের গান শুধু অসীমের অধিকারী নয় বরং অনেকটাই জীবনমুখী। বাউলগানের নিজস্ব একটা ছন্দ আছে। যার চলনে সহজেই মন ছুঁয়ে যেতে পারে। এই চিরকালীন আধুনিক অকৃত্রিম সুর ও বাণীর টানকে অস্বীকার করতে পারেননি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। জমিদারী তদারকি করতে গিয়ে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথকে থাকতে হয়েছিলো বহুদিন। সেইসময় সেখানকার বৈরাগী ও বাউলদের গানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। শিলাইদহে কুঠিবাড়ির পাশেই ছিল ডাকঘর । সেখানে এক ডাক হরকরা ছিল। যার নাম গগন হরকরা। মানুষের সুখ-দুঃখের পসরা মোড়া চিঠি বিলি করতে করতে অদ্ভুত সব গান রচনা করতেন তিনি। তারই একটি গান 'আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যেরে' – এই ভাবেই মগ্ন রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেললেন – 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। বাংলাদেশের এই জাতীয় সংগীতটিতে আমরা বড় আপন করে পাই সহজিয়া রবিকে।

অনেকের মতে কুষ্ঠিয়ায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল লালন ফকিরের। এই প্রতিভাধর সাধক কবির গাওয়া বাউল সংগীত রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো। এছাড়াও শেখ মদন ফকিরের গানও তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো। বাউলগানের সহজ সরলতা কেমন ভাবে মানুষের মুখে মুখে ফেরে তা তিনি দেখিয়েছিলেন। তাই স্বদেশী গানগুলো যাতে সর্বসাধারণের পক্ষে সহজ গ্রাহ্য হয়, এই ভাবনা থেকেই বহু স্বদেশী গানকে তিনি লোকসংগীতের আঙ্গিনায় তথা বাউলগানের আঙ্গিকে তৈরী করেছিলেন।

যেমন – 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' – মূলগানটি হল 'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে'। কিংবা 'এবার তোর মরা গাঙে' – মূলগান 'মন মাঝি সামাল সামাল'।

সহজিয়া রবির হাত ধরে বাউলগান তার সংকীর্ণতার থেকে বেরিয়ে এসে, বৃহত্তর ভূমিতে পা রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ বিষয় এবং শৈলীতে বৈচিত্র্য সাধন করলেও, বাউল গানের সুরের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখেছেন। তাঁর বাউল সুরের বহুগানে আছে ধ্রুপদের মতো চারটি অংশ। তবে অধিকাংশ গানের সঞ্চারীর সুর রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টি। বাউলগানের গঠন প্রণালীর সঙ্গে মিল রেখেই এগুলি তিনি তৈরী করেছিলেন। তাঁর বাউলগানে রাগরাগিনী মিশেছে, অথচ বাউলগানের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যটি চমৎকার। যেমন – 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাও গো এবার যাবার আগে' গানটি গুরুদেবের বাউলগানের সুরের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাউল সুরের সঙ্গে পিলু রাগিনীর সুরের মিশ্রণে সৃষ্টি এই গান অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ের গানে বাউলাঙ্গের গান গুলো আমাদের উদাসী মনকে প্রকৃতির উদাত্ততার সঙ্গে কিভাবে যেন বিলীন করে দেয়। যেমন পূজা পর্যায়ের এই গানটি – 'আমার মন যখন জাগলি নারে'। কিংবা প্রেম পর্যায়ে

‘ডাকবো না ডাকবো না অমন করে’। অথবা প্রকৃতি পর্যায়েতে লিপিবদ্ধ – “ফাগুন হাওয়ায়, হাওয়ায়”। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানেও বাউলগানের সহজ রূপের অনবদ্য ছবি সমুজ্জ্বল।

আসলে বাউলের চরিত্রে বৈরাগ্যের ভাবটি রবীন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। বাউলের স্বাভাবিক আকর্ষণ ঘর ছেড়ে পথে নেমে আসার দিকে। এই পথের টানেই তিনিও পাড়ি জমিয়েছেন সুদূরে, দূর থেকে আরো দূরে। তাই তো তাঁর ‘ফাল্গুনী’ নাটকে অন্ধ বাউলকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার মধ্যে দিয়েই পাড়ি দিয়েছিলেন সুদূরে, দূর থেকে আরো দূরে। এই অন্ধ বাউলের মধ্যে দিয়েই কি তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি যে নিজেকে ‘রবি বাউল’ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। সহজিয়া কবির মনে সেই প্রশ্নটিই বারবার উঁকি দিয়েছে – “পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায় ?”

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসংগীত ও ব্যক্তিগত অনুভব

একটি গান কখন গান হয়ে ওঠে আর কখনই বা তা সংগীতের আত্মাকে পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র গানের খোলস রেখে যায় – সংগীত ও ছদ্মসংগীতের এই সীমান্তরেখাকে চিহ্নিত করতে হলে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতে হবে। তাঁর গানের কাছে এসে বসতে হবে নিভৃতে তাঁর সুরের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে জীবনের স্পন্দন। তাঁর গান কি শুধুমাত্র গীতবিতানের পাতায় ? যদি বলি তাঁর কবিতায়, তাঁর গল্পে তাঁর উপন্যাসের ভেতরেও রয়ে গেছে সংগীতের প্রবাহ তাহলেও বিন্দুমাত্র ভুল বলা হবে না। রবীন্দ্রনাথ চেতনে বা অবচেতনে সংগীতের ভেতরেই খুঁজেছেন তাঁর আশ্রয়। তাই তাঁর কবিতাও গীতিধর্মিতায় পরিপুষ্ট। তাঁর গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যে আমরা দেখতে পাই গানে ও নাটকে এবং গানে ও নৃত্যে মিলে তৈরি হয়েছে এক নতুন সৃষ্টির অভেদ রূপকল্প। সুর তাঁর গল্পকে সীমার মাঝে করে তুলেছে অসীম। যোগাযোগ, শেষের কবিতা এবং আরও অধিকাংশ উপন্যাসে গানের গুনগুনানি তিনি বুনে দিয়েছেন পাতায় পাতায় যা তাঁর উপন্যাসকে করেছে তাত্ত্বিক নিরীক্ষাধর্মী এবং চিরস্থায়ী। গান রয়ে গেছে তাঁর ডায়েরীর পাতাতেও "গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিশীল। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খামখেয়ালী মেজাজ দিয়ে গড়া তোরণ একটি অপূর্ব মুহূর্তকাল সেই তোরণের নীচে দিয়ে জয়যাত্রা করবে। মেজাজের এই রঙিন খেয়ালই হচ্ছে গীতিকাব্য (পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী) ।"

রবীন্দ্রনাথ সুরকেই বহন করেছেন তাঁর শিল্পে। তাঁর শিল্পীসত্তার আবহ জুড়ে বেজে উঠেছে সংগীতের মূর্ছনা। কখনও রূপে, কখনও বা অরূপে। আনন্দের ভেতর দিয়ে সঙ্গীত যেমন তার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক সেরকমভাবেই বেদনা নিংড়ে যা উঠে এসেছে তা গানেরই নির্যাস। রবীন্দ্রদর্শন শুধুমাত্র চোখের সামনে ঘটমান ক্ষুদ্র বর্তমানের প্রতিবিম্ব নয়, বিন্দুর মধ্যে তিনি অনন্তের ধ্বনিই শুনতে পেয়েছেন তাই তাঁর উপলব্ধি – "সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয় ... চিরকালটা থাকে আড়ালে, গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে তাতেই মন মুক্তি পায়"। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ অনন্ত পথের পথিক তাই তিনি গানের ভেতর দিয়েই খুঁজেছেন রহস্যময় পৃথিবীর ইশারা – "যা আছে কেবলমাত্র তারই বোঝা নিয়ে ঝগড়া চলে, যা নেই তারই আশা নিয়েই গান" যা নেই তা আসলে আগামীর ভেতর চিরকালের ভেতর বিলীন হয়ে আছে তাকে উপলব্ধি করা সবার সাধ্য নয়। সব গান তাই স্পর্শ করতেই পারবে না ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত অনুভবের এই ছায়া। গানের শরীর থেকে খসে পড়বে জড়ত্বের এই খোলস। আর যা প্রকৃতপ্রস্তাবে গান হয়ে উঠবে তা অবশ্যই হয়ে উঠবে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। যা কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে আকুলিত করবে, শ্রোতার দিব্যকান আর দিব্যমনের সংযোগ ঘটাবে, জাগরিত করবে এবং শ্রোতা সারাজীবন বয়ে বেড়াবে অসীমকালের এই হিল্লোল –

"যে গান কানে যায় না শোনা,
সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে ।"

অতলকে স্পর্শ করার জন্য তিনি অনেক কথাই বলেছেন আমাদের কানে কানে –

"অনেক কথা বলেছিলাম কবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে"

এই গোপন গানগুলিই তো ছড়িয়ে আছে তাঁর সামগ্রিক শিল্পের ভেতর। কাব্যকৃতির বা কথাশিল্পের অন্তর্বয়নে গ্রথিত হয়েছে গানের সারবস্তু। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলনই তাঁর সাধনা। সুরের ভেতর দিয়ে কল্পভুবনের চিত্রকেই তিনি এঁকেছেন যার নৃত্যতরঙ্গিত দোলায় আমাদের সত্তা ডুবে যায় গভীর থেকে গভীরে। মায়ালোক আচ্ছন্ন করে রাখে আমাদের ভেতর আর বাইরের আকাশ। তিনি গানের ভেতর দিয়ে দেখেছেন পৃথিবীর চিরন্তন রূপ ও রস। এখানেই তাঁর সিদ্ধি ও সার্থকতা।

“গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি”

জয়তী রায়

অভিমানী রবিবার

আজ শনিবার। ১৮৮৪ সালের ১৯শে এপ্রিল। মধ্যরাত এখন। ঘড়ির আইনে রবিবার পড়ে গেল। গতবছর এইসময় সারাদিন ব্যস্ত ছিলে তুমি। আমার চোখের আড়ালে চুপি চুপি নতুন কিছু বানিয়ে রাখার কাজে উৎসাহের কমতি ছিল না। চেনাজুতোয় পা গলাতে গিয়ে দেখতাম সে পশম ফুলের মালা গলায় পরে বসে আছে! মশারির চাল নিতান্ত নীরস বলেই জানতুম, সেখানে সুতোর কাজের বাহারি রঙিন বাগান ফুটিয়ে তুলে রাতের ঘুম আনন্দময় করে তুলতে তুমিই পারো বৌঠান। যেখানটায় বসে লেখালিখি করবে তোমার রবি, সেখানে ফুল সাজিয়ে রাখতে একদিনও ভুল হয়না তোমার। মনে পড়ে এক অলস দ্বিপ্রহরের প্রান্ত বেলায় মালা গাঁথতে গাঁথতে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, সারা আকাশ তোমার পানে চেয়েছিল, ফুলগুলি ঝরে পড়েছিল নীল শাড়ির আঁচল হতে, মেঘ ছেঁড়া আলো এসে পড়েছিল তোমার খোলা চুলে ... কি অপরূপ। কি অপরূপ দৃশ্য। কিছু বলব বলে এসেছিলেম, চেয়ে রইলাম কিছু না বলে। ফিরেও গেলাম লেখার টেবিলে। চোখ আর মন দুটোই তখন ঘোরে আচ্ছন্ন।

***

এ বছর আর কটা দিন পরেই আমার জন্মদিন, আর তুমি শুয়ে আছো ? তোমার বন্ধ চোখের কোলে দুফোঁটা জলের বিন্দু ? তুমি এখনো বেঁচে আছো নতুন বৌঠান ? এখনো শ্বাস বইছে তোমার ! এখনো আশা আছে তবে ?

বাবামশায়ের কড়া বারণ। কেউ যেন এদিক পানে না আসে। ঠাকুরবাড়ির সম্মান কোনমতে নষ্ট না হওয়াই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু আজ আমার সরে যাবার শক্তি নেই। পারব না। বাবামশায় ঈশ্বরের মত। তাকেও অগ্রাহ্য করে বসে আছি তোমার দুয়ারে। তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। পরিজনের ফিসফিস ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠাকুরবাড়ির আনাচে কানাচে। অনুভবের পবিত্রতা দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া যাবে না মানুষের চিরকালীন কৌতূহল। নর আর নারী ... বন্ধু হতে পারে না। হাত ধরতে পারে না। একসঙ্গে বসে গান গাইতে পারে না। কাঁধে মাথা রেখে চোখের জল ফেলতে পারবে না। তর্জনী উঁচিয়ে ছুটে আসবে সমাজ। নাম জানতে চাইবে সম্পর্কের। তোমরা দেবর – বউদি। তোমাদের এইটুকু গন্ডি। তার ভিতর থাকো। গল্প কবিতা হাসি গান এখানে চলবে না। যদি চাও তবে আড়াল রেখো আরো একজনের। স্ত্রী অথবা স্বামী থাক মাঝখানে।

বৌঠান! তুমি একমাত্র নারী ... যার কাছে ধরা পড়েছিল আমার অন্তরমহলের গভীরতম গোপন ইচ্ছে। সাহিত্য সাধনার কঠোর পথের সমস্ত অপমান উপেক্ষা অসম্মান নিয়ে প্রচন্ড ঝড়ের মত আছড়ে পড়তাম তোমার আশ্রয়ে। সেলাই করতে করতে কৌতুকে তাকিয়ে বলে উঠতে ... তুমি লিখতে পারো কই ? বিহারীলালবাবু, বঙ্কিমবাবু কই পারো এঁদের মত ?

পারিনা আমি পারি না ? তবে এই যে এত লোক বাহা বাহা করে।

দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে উজ্জ্বল দুটিচোখ ধ্রুবতারার মত স্থির রাখতে আমার অস্থির দিকভ্রষ্ট মুখের উপর। বামহাতের মসৃণ ত্বকে একটি হীরের আংটি। শ্যামল বরণ শরীর ঘিরে সবুজ ডুরেশাড়ি। ছোট্ট কপাল ঘিরে খোলা চুলের রাশি। ঠোঁট টিপে বলে উঠতে : ওরা তোমার লেখা বোঝে কোথায় রবি ? ঠাকুরবাড়ির রাজপুত্তুরকে মাথায় করে নাচে। আড়ালে নিন্দে করে। বিখ্যাত হলেই কি লেখক হয় ?

জেদ চেপে যেত মাথায়। প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে নিজেকে। বিখ্যাত হয়ে নয়। লেখক হয়ে। ওই

হীরের আংটি পরা হাত যেন কপালে ছুঁইয়ে দেয় বিজয়ীর তিলক। ওই চোখে ফুটে উঠবে প্রশংসা, এই আশায় রাতদিন বিভোর হয়ে থাকতাম। শব্দরাশি ছন্দ ভাবের নৌকায় সওয়ারি হয়ে ভাসতে ভাসতে খেয়াল থাকত না এক ম্লানমুখী একাকী তরুণীর কথা ! তোমার কোনো বন্ধু ছিল না বৌঠান। পরিবারের মহিলারা পছন্দ করত না তোমায়। নারীমহলের দুপুর আড্ডার কূটকচালি আচার আমসত্ত্ব বড়ির আলোচনায় স্বচ্ছন্দ ছিলে না তো। তাই তুমি নাক উঁচু ছিলে ওদের কাছে ! বাপেরবাড়ি গরীব তবু কিসের দেমাক ? সন্তান নেই। বাঁজা। তবু এমন হাসি কেন খেলে ? সুপুরুষ স্বামী গভীর রাত পযর্ন্ত থিয়েটার নিয়ে মত্ত। তবু কেন পা পড়ে না মাটিতে ? কেন ঘুরে বেড়ায় না জায়েদের পিছু পিছু। তিনতলায় থাকে রানীর মত। কবিতা পড়ে। গান করে। করুক। কিন্তু, আমাদের সঙ্গে করুক। একলা কেন ? আলাদা কেন ? আর, রবি কেন ওর সঙ্গে থাকে ? কি এমন আছে ওর ? রবি কেন ওখানেই ঘুরে ঘুরে আসে !

আজ বুঝেছি, আমি ছিলাম তোমার আলো। তোমার একমাত্র সখা। তোমার অহঙ্কার। ঠাকুরবাড়ির রত্নসন্তান তোমার আশ্রয়ে ... এই গর্ব অপরূপ করে তুলত তোমায়। কোনো দুঃখ স্পর্শ করত না। এদিকে আমি ?

আমার লেখার প্রতি তোমার উপেক্ষা জয় করতে গিয়ে হয়ে উঠলাম বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক। সময় রইল না আর! জানালার গরাদ ধরে অপেক্ষায় থাকা মুখটি আর আকর্ষণ করত না। ছাদবাগানের গাছগুলি শুকিয়ে গেল। ফাগুন সন্ধ্যায় সেখানে এসরাজের সুর বেজে উঠত না। জ্যোতিদাদা, আমি আমরা কেউ ই আর তোমাকে চাইতাম না। স্বীকার করছি বৌঠান, তোমাকে ভয় পেতে শুরু করেছিলাম। তীব্র অভিমান ভরা চোখদুটির থেকে আড়াল খুঁজে পালিয়ে চলতাম। আমাদের ছোট্টঘর, ছাদের বাগান, টুকরো কথা, পানের বাটা, লেখা নিয়ে খুনসুটি ... ওই সব আর মানায় না যে ! তখন ডাক পড়েছে বিশ্বপ্রাঙ্গণে। তখন সত্যেনদাদার আলাদা বাংলো, জ্ঞানদা বউঠানের সাহেবী কেতা, ইন্দিরার সৌন্দর্য ইংরেজি সাহিত্য পিয়ানোর সুর ... ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ থেকে একেবারে আলাদা। তোমার ওইটুকু ঘরে তখন মানাবে কেন মধ্যাহ্ন সূর্য। কিশোরী স্ত্রী মৃণাল যদি কিছু বুঝে ফেলে? ভয় পেতাম। অন্তঃপুরে তখন পরিচর্যা চলছে মৃণালিনীর। তুমি সেখানেও অবাঞ্ছিত। মৃণাল তোমাকে এড়িয়ে চলত। তুমি অপরাধীর মত অন্ধকার ঘরে ঢুকে একলা বসে থাকতে। ইতিহাস বলবে, আত্মহত্যার কথা। কেউ জানবে না তোমাকে হত্যা করা হয়েছে। কে সেই হত্যাকারী ! সে কথা জানব আমি। একমাত্র আমি। সব সম্মান, সব কবিতা – চোখের জলে ঝাপসা আজ। তোমার অভিমানী মুখটি ছাড়া চোখের সামনে আর কিচ্ছুটি নেই।

***

নতুন বৌঠান!

গম্ভীর মুখের ডাক্তার এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। কত কি ই বলে যাচ্ছে। তোমার জীবনের আর আশা নেই না কি! কালকের মধ্যে নিভে যাবে তোমার জীবন দীপ।

ছাদের ঘরের জানালা দিয়ে খোলা আকাশ। গভীর গহন রাতের তারার পথ দিয়ে তুমি একলা চলে যাবে ?

জীবনের দিনগুলিতে আরো কত রবিবার আসবে বৌঠান, আরো কত আলো গান বেজে উঠবে বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে! কিন্তু, এই অভিমানী রবিবার চিরকালের বেদনার বসত গড়ে দিল, সেখানে সুখের সেতার বাজবে না কোনোদিন!

***

সোজা স্থির বসে রবীন্দ্রনাথ। ভেজা চোখের পাতার সামনে ভোরের আলো ফুটল ধীরে ধীরে। অস্ফুট স্বরে পাঠ করতে লাগলেন বেদমন্ত্র

"অসথ মা সদগময় ... ।।"

শ্যামলী আচার্য

তুমি আমাদের পিতা

শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয় লিখছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯৬ সাল। এদিকে শিলাইদহে তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য কেনা হয়েছে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা'। পড়া চলছে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ' আর রামায়ণ। মধ্যমা কন্যা রেণুকার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় মাধুরীলতা, তিন বছরের বড় রথীন্দ্রনাথ, এই তিন পুত্র-কন্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ এবার কলম ধরেছেন। লিখছেন,

"ক-য় কথা / খ-খায় খই
গ-গায় গান / ঘ-ঘুমোয় ঘরে
ঙ-করে উঁ আঁ / তার চোখে লাগে ধুঁয়া" ...

এদের কাউকে কোনও প্রথাগত বিদ্যালয়ের পাঠ নিতে হয়নি কখনও। রবীন্দ্রনাথ চাননি তাঁর পুত্র-কন্যারা গণ্ডিবাঁধা ইস্কুলের মার্কামারা শিক্ষায় শিক্ষিত হোক।

১৮৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে জোড়াসাঁকো ছেড়ে শিলাইদহে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। নিজের পুত্রকন্যাদের তিনি কোনও সাধারণ স্কুলে কখনও ভর্তি করেননি। নিজের স্কুল জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা ভুলতে পারেননি যে! তাঁর নিজের ছাত্রজীবন শুরু বাড়ির কাছেই ৮৩ নম্বর চিতপুর রোডে শ্যামাচরণ মল্লিকের বাড়িতে নর্মাল স্কুলে। সরকারিভাবে সেই স্কুলের নাম ছিল 'ক্যালকাটা গর্বমেন্ট পাঠশালা' বা 'ক্যালকাটা মডেল স্কুল'। কিন্তু নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য নিজেই উদ্যোগী হয়ে শুরু করলেন পাঠশালা। অবনীন্দ্রনাথের কথায়, রবীন্দ্রনাথ প্রথমে গৃহবিদ্যালয় খুলেছিলেন তাঁদেরই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'তে লিখছেন, "রবিকাকার খেয়াল গেল ছোটদের স্কুল করতে হবে। নীচের তলায় ক্লাসঘর সাজানো হল বেঞ্চি দিয়ে, ঝগড়ু চাকর ঝাড়পোঁছ করছে, ঘন্টা জোগাড় হল, ক্লাস বসবে। কোত্থেকে মাস্টার ধরে আনলেন। কোথায় কী পাওয়া যাবে, রবিকাকা জানতেনও সব। ছেলেদের উপযোগী বই লিখলেন, আমাকে দিয়েও লেখালেন। ওই সময়েই 'ক্ষীরের পুতুল', 'শকুন্তলা' ওই-সব বইগুলি লিখি। নানা জায়গা থেকে বাল্যগ্রন্থ আনালেন।" দেশের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার উপর রবীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। নিজের স্কুলজীবনের তিক্ত স্মৃতি তো ছিলই। তিনি মনে করতেন ইশকুলগুলি কারখানার মত – ঘন্টা দিয়ে সে কারখানার দরজা খোলে। কলে-ছাঁটা বিদ্যা বিতরণ চলে বছরভর আর বছর শেষে ছাত্রদের ওপর মার্কা মেরে দিয়ে তার কাজ শেষ হয়। এর ফলে দেশের মানুষেরাও পরিণত হচ্ছে একেকটি নিরেট যন্ত্রে। এ বিষম বিপদের হাত থেকে দেশকে, দেশবাসীকে পরিত্রাণের দায় নিয়ে সর্বস্ব পণ করে তিনি কাজে নেমেছিলেন। সে কর্মযজ্ঞ অব্যাহত ছিল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তবে সে আরেক কাহিনি। আজ বরং বলি তাঁর ছেলেমেয়েদের গুরুমশাই হয়ে কেমন করে কাটিয়েছিলেন শিলাইদহের নির্জন সন্ধ্যা।

রথীন্দ্রনাথ তখন নিজেই ছিলেন ছাত্র। জোড়াসাঁকোর এই পাঠশালার কথা তিনি বলেছেন 'পিতৃস্মৃতি'তে।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য ঠাকুরবাড়িতে স্কুল তো খোলা হল। কিন্তু দশ-পনেরোজনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী জোটেনি। বরং শুধু মাধুরীলতা আর রথীন্দ্রনাথের হাতে-খড়ি হল এখানে। পরে যখন শিলাইদহে পাকাপাকি সংসারী রবীন্দ্রনাথ, তখন নিজেই ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ভার নিলেন। বেলা ও রথীর জন্য কলকাতা থেকে আনাচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দূর্গেশনন্দিনী, দেবীচৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর ও আনন্দমঠ। বয়স কম হলেও প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস

পড়তে বাধা দেননি তিনি। প্রতিদিন ভালো ভালো কবিতা শুনিয়ে তাদের মুখস্থ করতে দিতেন। তিনশো ছত্রের সুদীর্ঘ সেই যে কবিতা, 'নদী', সেই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর স্বরচিত বিজ্ঞপ্তিসহ। যুক্তাক্ষরবিহীন এই কবিতাটি প্রসঙ্গে কবি জানাচ্ছেন, "এই কাব্যগ্রন্থখানি বালকবালিকাদের পাঠের জন্য রচিত হইয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছি ইহার ছন্দ শিশুরা সহজেই আবৃত্তি করিতে পারে।" বেশ অনুমান করা যায়, এই ছন্দের পরীক্ষানিরীক্ষা তাঁর নিজের শিশুপুত্রকন্যাদের কথা ভেবেই শুরু হয়।

শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়াতেন লরেন্স সাহেব, মিস পারসনস, মিস লিন্টন, মিস এলজিও। এঁদের মধ্যে 'পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ সাহেব লরেন্স' এর পড়ানোর বৈশিষ্ট্য সবথেকে বেশি আকৃষ্ট করেছে রবীন্দ্রনাথকে। পন্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য পড়াতেন সংস্কৃত। শিবধন বিদ্যার্ণবের বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ মুগ্ধ করেছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে। কবির নির্দেশে সহজে সংস্কৃত শেখানোর জন্য হেমচন্দ্র লিখছেন 'সংস্কৃত শিক্ষা'। এই বইয়ের দুটি খণ্ডের সম্পাদনা করছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

মাধুরীলতার চিঠি থেকে তাঁর সংস্কৃত পড়াশোনার কিছু খবর পাওয়া যায়। তিনি বাবাকে লিখছেন, "শকুন্তলার তর্জমা ভালো এগোচ্ছে না। অতীত ক্রিয়া ভালো করে না জানাতে অনেকক্ষণ ব্যাকরণ কৌমুদী ঘাঁটতে হয়। ... আমাদের হাইলি ইন্টারেস্টিং মনুসংহিতা নিয়মিত চলচে। দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত দাগ দেওয়া ছিল, তাই পণ্ডিত মহাশয় এখন কী পড়াবেন ভেবে পাচ্ছেন না। তৃতীয় অধ্যায় থেকে বেছে বেছে পড়া দিচ্ছেন।" লক্ষণীয়, ব্রাহ্ম পরিবারের মুক্তচিন্তক রবীন্দ্রনাথের 'মনুসংহিতা' নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও মেয়েদের কিন্তু সাহিত্যের সমস্ত রস আহরণ করার উৎসাহ দিয়েছেন। শুধু মনুসংহিতা নয়, তাঁর মেয়েরা মন দিয়ে পড়েছেন বিষ্ণুপুরাণ।

ছেলেমেয়েদের বাংলা পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। বুদ্ধিমতী বেলার জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার ভার তিনি তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। সেই কারণে বারে বারে বিঘ্ন ঘটছে 'চোখের বালি' উপন্যাস রচনায়। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে চিঠিতে জানাচ্ছেন, "আমি ছেলেদের পড়া লইয়া ব্যস্ত আছি বলিয়া বিনোদিনীর প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।"

কন্যাদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি নিয়মিত পরামর্শ নিয়েছেন ভগিনী নিবেদিতার। রামায়ণ-মহাভারত-পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না যে। অতএব কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীও স্বামীর পরামর্শে উদ্যোগী হয়েছেন সংস্কৃত রামায়ণ তর্জমার কাজে। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহাভারত অনুবাদের। বিদেশি ভাষার কালজয়ী সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ নিজে পড়ে শোনাচ্ছেন পুত্র-কন্যাদের। কখনও বলছেন মার্ক টোয়েনের গল্প, কখনও পড়ছেন মলিয়েরের নাটক। প্রিয়নাথ সেনকে শিলাইদহ থেকে অনুরোধ জানাচ্ছেন, 'চয়েস ওয়ার্কস অব মার্ক টোয়েন আর মার্ক টোয়েনস লাইব্রেরি অব হিউমার' বইদুটি চাইই চাই। কারণ, "সায়াহ্নে পরিজনমণ্ডলীকে চতুর্দিকে আকৃষ্ট করে দীপালোকে একটা কিছু পড়ে শোনাতে হয়। পরীক্ষা করে দেখলুম মার্ক টোয়েনের হাস্যরস আমার অপত্যকলত্রের কাছে সর্বাপেক্ষা কৌতুকজনক বোধ হয়। ... আমার রসদ ফুরিয়ে এসেছে, আর দু'তিনদিনের মতো আছে। অতএব শীঘ্র কিছু খোরাক না পাঠিয়ে দিলে সন্তানসন্ততি বর্গের আক্রমণ কিছুতেই ঠেকাতে পারব না।"

ইংরেজ লেখকদের মধ্যে ডব্লু এইচ হাডসন সম্পর্কে তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। হাডসনের ভ্রমণকাহিনি থেকে নির্বাচিত অংশ নিয়মিত শোনাতেন বেলা আর রথীকে।

শিলাইদহে জমিদারি-সেরেস্তাখানায় কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন জগদানন্দ রায় এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা জগদানন্দ 'সাধনা' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক সেইসব প্রবন্ধের ঝরঝরে প্রাঞ্জল ভাষা আর সহজ সরল গদ্যরীতিতে আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ। জমিদারি সেরেস্তাখানার কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর

কাজ হল কুঠিবাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়ানো। গৃহবিদ্যালয়ে এই শিক্ষকতা তাঁকে তৃপ্ত করেছিল নিঃসন্দেহে। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম-বিদ্যলয়ের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারীদের চিহ্নিত করে নিতে শুরু করলেন এই সময় থেকেই।

সহজ পাঠ রচিত হয় এর বহুকাল পরে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করেই সহজ পাঠের সূচনা। কিন্তু ১৩০৬ সালে সহজ পাঠ রচনার প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়েছিলেন শিশুপাঠ্য এক বর্ণপরিচয় রচনায়। সেই বর্ণপরিচয়ের খসড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে 'মজুমদার-পুঁথি' কিংবা 'পকেটবুক' নামে কবির রচনার এক পাণ্ডুলিপিতে। সেই পকেটবুকের ওপরে ইংরেজিতে লেখা 'আর এন টেগোর/পকেট বুক/১৮৮৯।'

পকেটবুকের সেই খসড়াই পরবর্তীকালে ঘষে-মেজে পরিমার্জন করে 'সহজ পাঠ'-এর রূপ ধারণ করল।

"দুই বাবু অ আ/বসে খায় হাওয়া
দুই মেয়ে ই ঈ/শীতে কাঁপে হী হী।
দুই বুড়ি উ ঊ/কাঁদে বসে হূ হূ।..."

খসড়া পড়লেই বোঝা যায়, নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক স্তরে এটি ব্যবহার করলেও এই খসড়া আর পরবর্তীকালে সর্বসমক্ষে আনেননি রবীন্দ্রনাথ।

১৯০১ সালের ডিসেম্বর। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তৈরি করেছেন ব্রহ্মবিদ্যালয়। শিলাইদহের নির্জন নদীতীরের বাস উঠিয়ে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছেন মহর্ষির জনবিরল আশ্রমে। আরম্ভ হয়েছে কবিজীবনের নতুন অধ্যায়। আশ্রমে ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। ইতিমধ্যেই নিজের প্রায় নাবালিকা দুই কন্যা মাধুরীলতা ও রেণুকার বিবাহ দিয়েছেন। এরই মধ্যে চলেছে বিদ্যালয় পরিচালনার বিস্তারিত পরিকল্পনা। কবি-পরিবার যখন শান্তিনিকেতনে নতুন করে বাসা বেঁধেছেন, ছোটমেয়ে মীরার গৃহশিক্ষা চলেছে পুরোদমে। নতুন সুযোগ ঘটেছে ছবি-আঁকা শেখার। ছোটছেলে শমীন্দ্রনাথ ও ছোটমেয়ে মীরা তখনও আশ্রম-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। তারা ছবি আঁকা শিখছে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ছাত্র কার্তিকচন্দ্র নানের কাছে। মীরার বয়স যখন দশ বছর সাত মাস, তখন শমীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পড়ানো ও সেলাই শেখানোর জন্য বিদেশিনী মেমের সন্ধান করছেন পিতা। শুধু পড়াশোনা নয়, গার্হস্থ্য-জীবনের উপযুক্ত করে তোলার জন্যও তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। ১৯০৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত মীরা ছিলেন মজঃফরপুরে, বড়দিদি মাধুরীলতার সংসারে। ম্যাথু আর্নল্ডের 'সোহরাব রুস্তম' শেষ করে টেনিসনের 'এনক-আর্ডেন' শুরু করতে হয়েছে মীরাকে। ভাষার ওপর দখল বাড়ানোর জন্য বাবা তাদের ইংরেজিতে চিঠি লিখতে বলতেন; নিজেও সমস্ত চিঠির উত্তর দিতেন ইংরেজিতেই। কখনও মীরাকে বলছেন মহাভারত, ডেভিড কপারফিল্ড, অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড, আইভ্যান হো পড়তে; কখনও আবার খোঁজখবর নিচ্ছেন সকলের শরীর-স্বাস্থ্য আর মজঃফরপুরের পরিবেশ-প্রকৃতির। এমনকি মীরার বিবাহের পরেও বাবার চিঠিতে রয়েছে পড়াশুনোর উপদেশ; নববিবাহিতা কন্যাকে স্কটের কেনিলওয়ার্থ পড়তে পরামর্শ দিচ্ছেন এক সাহিত্যিক পিতা।

বড়মেয়ে মাধুরীলতাকে সুশিক্ষিতা করে তোলার ব্যাপারে বাবার ছিল অধীর আগ্রহ। শুধু সাহিত্য নয়, বেলাকে কর্মশিক্ষা দিতে আগ্রহী তিনি। নার্সিং, রোগশুশ্রূষা এমনকি স্যানিটেশান নিয়েও নিত্যনতুন বই আনিয়ে তাকে নিজে পড়িয়ে চলেছেন এক দায়িত্ববান পিতা। জ্যেষ্ঠাকন্যা মাধুরীলতার বিয়ের মাত্র একমাস চব্বিশ দিন পরেই ১৯০১ সালের ৯ আগস্ট বিবাহ দিলেন সাড়ে দশ বছরের রেণুকার। নিয়তির পরিহাসে মাত্র বারো বছর সাত মাস বাইশ দিন রেণুকার আয়ুষ্কাল। যক্ষ্মায় আক্রান্ত রেণুকাকে নিয়ে হাজারিবাগ, গিরিডি, মধুপুর হয়ে কবি পৌঁছেছেন আলমোড়া। প্রায় সাড়ে তিনমাস এই মাতৃহীন অভিমানিনী কন্যার শুশ্রূষা করেছেন একা এক স্নেহময় পিতা। একের পর এক 'শিশু'র কবিতায় তখন উজাড় করে দিয়েছেন নিজের শৈশব স্মৃতি। প্রায় তিরিশটি নতুন কবিতা লিখলেন এই সময়। পীড়িতা কন্যার বিছানার পাশে বসে কবি শোনাচ্ছেন,

"...আমার নৌকা সাজাই যতনে
শিউলি বকুলে ভরি
বাড়ির বাগানে গাছের তলায়
ছেয়ে থাকে ফুল সকালবেলায়,
শিশিরের জল করে ঝলমল
প্রভাতের আলো পড়ি।
সেই কুসুমের অতি ছোট বোঝা
কোন দিক পানে চলে যায় সোজা,
বেলাশেষে যদি পার হয় নদী
ঠেকে কোনওখানে যেয়ে –
প্রভাতের ফুল সাঁঝে পাবে কূল
কাগজের তরী বেয়ে। ..."

প্রতিদিন সকালবেলায় মৃত্যুপথযাত্রী কন্যাকে বারান্দার এককোণে বসিয়ে উপনিষদ থেকে মন্ত্রপাঠ করে তার মানে বুঝিয়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। এইভাবেই হয়ত তার কোমল মনটিকে সংসারের কঠিন মায়ার বাঁধন থেকে মুক্তিলাভ করবার পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে বাবাকে রেণুকা বলেছেন, "বাবা, পিতা নোহসি বলো।" যে পুত্রকন্যাদের জীবনের চলার পথের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন, তাদেরই একজনকে পিতা শোনালেন সেই চিরন্তন প্রার্থনা মন্ত্রঃ

"ওঁ পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেহস্তু
মা মা হিংসীঃ"।

শেষ সন্তান শমীন্দ্রনাথ। ক্ষণজন্মা শমীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত ছাত্রজীবনের পরিচয় মেলে সেই সময়কার শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম ও শেষ এই সন্তানটি শৈশবে মাতৃহীন, অল্প বয়স থেকেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র। শমী অল্পবয়স থেকেই শ্রুতিধর। বিসর্জনের মত শক্ত নাটকের কবিতাও অনর্গল আবৃত্তি করতেন। আট বছরের বড় দাদা রথী যখন কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন, তখন একের পর এক চিঠিতে ছোট ভাই শমী উজাড় করে দিয়েছেন তার মনের কথা। সেইসব চিঠির ছত্রে ছত্রে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর রসগ্রাহী মনের নাগাল পাওয়া যায়। দাদা লিখছেন, "বড় হলে সে যে কবি হবে, বাবার প্রতিভা তার মধ্যেই প্রকাশ পাবে, আমার সন্দেহ ছিল না।"

১৯০৭ সালের সাতই অগ্রহায়ণ শমীন্দ্রনাথ চলে যান অমৃতধামে। ঠিক পাঁচ বছর আগে এই রকমই সাতই অগ্রহায়ণে অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেছিলেন কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী। আশ্চর্য এক সমাপতন। 'শিশু' কাব্যের নায়ক 'খোকা' তৈরি হয়েছিল শমীর আদলে। কবি বলেন, "আমার কবিতাগুলি সবই খোকার অর্থাৎ শমীর নামে। কবিতাগুলি যখন লিখেছিলাম তখন শমী ও তার মায়ের জীবনটাই আমার সামনে ছিল। ... খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠমধুর সম্বন্ধ সেইটি আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী – তখন খুকী ছিল না – মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্তী-সম্রাট ছিল। সেইজন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে – সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এইরকম খেলা খেলবে – তাকে নিবারণ করতে পারিনে।"

মৃত্যুমিছিল তাঁকে বিচলিত করেনি কখনও। কোনও কিছুতে ফাঁক রাখেননি, ছেদ পড়েনি সাহিত্যসৃষ্টিতে। পত্নীবিয়োগের পরেও পুত্র-কন্যাদের প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্যে ছিলেন অবিচল। রেণুকা এবং শমীর অকালপ্রয়াণেও শান্ত, স্থির; পরিচয় দিয়েছেন ধৈর্য এবং সংযমের। তিনিও পিতা, তিনি পুত্রকন্যার প্রাণের মানুষ, আবাল্যের সহচর।

ঋণঃ

প্রশান্তকুমার পাল

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সংগ্রামী লাহিড়ী

রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণুপুর ঘরানা

১৮৯২ সালের ৫ জুলাই সাজাদপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লিখলেন:

"আমার আজকাল ভারি গান শিখতে ইচ্ছে করে – বেশ অনেকগুলো ভূপালী ... এবং করুণ বর্ষার সুর – অনেক ভালো ভালো হিন্দুস্থানী গান – গান প্রায় কিচ্ছুই জানি নে বললেই হয়।" (ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাংলাদেশে ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক জমিদারি শিলাইদহ ও সাজাদপুরে। দেবেন্দ্রনাথ জমিদারি দেখাশোনার কাজে রবির ওপরেই নির্ভরশীল। ত্রিশ বছরের পূর্ণ যুবক রবীন্দ্রনাথ তাই এসেছেন শিলাইদহে। পদ্মানদীর ওপর বোটেই থাকেন বেশিরভাগ। পদ্মার কূল-ছাপানো জলে বর্ষার সজল মেঘ ছায়া ফেলে। "নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়" বর্ষণগীত মুখরিত হয়। মনে আসে কত স্মৃতি, ছেলেবেলার কথা, কত পাওয়া, না-পাওয়া। কাগজকলম নিয়ে রবিকাকা কলকাতায় ভাইঝি বিবিকে চিঠি লিখতে বসেন। বিবির কাছে তিনি মনটা যেমন খুলতে পারেন এমনটি আর কারোর কাছেই নয়।

মনে মনে হারিয়ে যান তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিরাট অন্দরমহলের আনাচে কানাচে। ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের গান শেখাবার জন্যে আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। একাধিক ওস্তাদ আছেন মার্গসংগীত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। সুরের দীক্ষা দেবেন, রাগরাগিনীর সঙ্গে পরিচয় করাবেন তাঁরা। সেকালের সেরা ওস্তাদ যদুভট্ট, যদুনাথ ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুরী আঙ্গিকের ধারক ও বাহক। চেষ্টা করেন ছোট্ট রবিকে পাকড়াও করে গান শেখাতে। কিন্তু রবির যে ধরাবাঁধা জিনিসে মন নেই ! স্কুলে যেতে তার ভাল লাগে না। ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষায় অনীহা। পালিয়ে বেড়ায় সে। যদুভট্ট হার মানলেন। রবির প্রথাগত সংগীতশিক্ষা হয়ে উঠল না। কিন্তু কানে যে সবসময় সুরের আনাগোনা। বাইরে তুমুল বৃষ্টি, ভেতরে ভূপালীতে আলাপ ধরেছেন যদুভট্ট। জলধারার মতই ঝরে পড়ছে ঋষভ-গান্ধার-পঞ্চম-ধৈবতের সুরবিস্তার। ভূপালী রাগ আর বর্ষা যেন এক হয়ে যাচ্ছে রবির মনে। নিজেরই অজান্তে যদুভট্ট প্রবেশ করছেন চেতনায়। সুরের চলনটি অক্ষয় হয়ে যাচ্ছে স্মৃতিতে। যে স্মৃতি বারেবারে ছায়া ফেলবে পরিণত বয়েসে। বর্ষার গান বাঁধা হবে ভূপালী রাগে। তার অঙ্গে কালোয়াতি গানের জড়োয়া গয়না নেই, ব্যাকরণের বাধ্যবাধকতা নেই, আছে সরলতার মধুর এক সৌন্দর্য।

বহুযুগ পরে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তাঁর স্নেহভাজন দিলীপকুমার রায়কে, "বর্ষার দিনে ভিতরে ভূপালী সুরের আলাপ চলেছে, আমি বাইরে থেকে শুনছি। আর, কী আশ্চর্য দেখো, পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ষার গান রচনা করেছি তার প্রায় সব-কটিতেই অদ্ভুতভাবে এসে গেছে ভূপালী সুর।" (আলাপ-আলোচনা – রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায়, রবীন্দ্র রচনাবলী)

বিষ্ণুপুর ঘরানা

ভারতীয় মার্গসংগীতের বিষ্ণুপুর ঘরানার ওপর একটু আলো ফেলা যাক। মল্লভূম বিষ্ণুপুর ইতিহাসের শহর, মন্দিরের শহর, টেরাকোটা শিল্পের শহর আর মার্গসংগীতের শহর। UNESCO এ শহরকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তকমা দিয়েছে। এই শহরেই জন্ম নিয়েছে বাংলার এক ও একমাত্র নিজস্ব ঘরানা। গায়করা মূলত ধ্রুপদিয়া। ধ্রুপদ গেয়ে থাকেন। বিষ্ণুপুর-নিবাসী রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের নাম পাওয়া যায় আদিগুরু হিসেবে। তারও আগে ছিল কীর্তনের চর্চা। আশ্চর্য নয় যে কীর্তনের সুর বিষ্ণুপুরের গায়কিতে প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথের গানেও কীর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বিষ্ণুপুরে মার্গসঙ্গীতের চর্চা শুরু হয় রামশঙ্করের হাত ধরে, মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে। কিন্তু রামশঙ্করের শিক্ষাগুরু কে ? কীর্তন থেকে সুরের নদীটি বয়ে গিয়ে ধ্রুপদকে কেমন করে আপন করল ?

মতদ্বৈধ আছে এ নিয়ে।

প্রচলিত ধারণা আছে তানসেন-বংশীয় এক গায়কের হাতে বিষ্ণুপুর ঘরানার সূত্রপাত। তাঁর নাম বাহাদুর খান বা বাহাদুর সেন।

গবেষক শ্রী দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় এই ধারণা সমর্থন করেন না। তাঁর মতে মথুরা-বৃন্দাবনের জনৈক 'পন্ডিতজি' ছিলেন রামশঙ্করের গুরু। পুরীধামে তীর্থযাত্রা সেরে ফেরার পথে তিনি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা চৈতন্য সিংহের সভায় কিছুকাল কাটান ও রামশঙ্করকে ধ্রুপদ শেখান।

বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম সংগীতগুণী সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তানসেনের বংশধরের তত্ত্বটি সমর্থন করেননি।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য দীর্ঘজীবনের অধিকারী ছিলেন। বিষ্ণুপুর শৈলীর ধ্রুপদের মূল সুরটি তিনিই বেঁধে দিয়ে গেছেন। "যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি ..."

একঝাঁক প্রতিভাবান শিষ্য আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর ধ্রুপদ গানে, শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। পুত্র রামকেশব ভট্টাচার্য্য, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য (যদুভট্ট) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই যদুভট্টকেই দেখি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বালক রবীন্দ্রনাথকে ধরে গান শেখানোর চেষ্টা করছেন।

যদুভট্টর পরের প্রজন্মে আসেন রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী। একই সঙ্গে আসেন অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন পুত্র – রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা সবাই অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য। এঁদের উল্লেখযোগ্য শিষ্যরা হলেন জ্ঞানেন্দ্র প্রকাশ গোস্বামী (জ্ঞান গোঁসাই), রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘরানার উজ্জ্বল প্রদীপটি ততদিনে বিষ্ণুপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। সে প্রদীপ আজ সত্যকিঙ্কর-পুত্র সঙ্গীতাচার্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকহাজার শিষ্য-প্রশিষ্যের কণ্ঠে ভাস্বর।

রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিকার

বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ যদুভট্টতেই শেষ নয়, পরের প্রজন্মগুলিতেও সেই সৌহার্দ্য অটুট। দু'জনের অবিচ্ছিন্ন সাঙ্গীতিক বিনিময় চলেছে। বিষ্ণুপুর ঘরানার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদীয়া আদি ব্রাহ্মসমাজে সংগীতাচার্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের হামেশাই তাঁকে দরকার হত গানের স্বরলিপি লেখার জন্য। সুরেন্দ্রনাথের লেখা চিঠিতে একটি সুন্দর গল্প পাওয়া যায়।

সেটা ১৯১০ সাল, বলা যায় গীতাঞ্জলির সময়। রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন সুরেন্দ্রনাথ খুব তাড়াতাড়ি স্বরলিপি লিখতে পারেন। শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠালেন, সঙ্গে সুরবাহার যন্ত্রটি নিয়ে যেতে হবে।

যেতেই হাতে কাগজ কলম ধরিয়ে দিলেন। গাইতে আরম্ভ করলেন "বাজে বাজে রম্যবীণা"। সুরেন্দ্রনাথের আঙ্গুল চলছে গানে সঙ্গে তাল মিলিয়ে। দিনুবাবু, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। দেখতে দেখতে গান শেষ, স্বরলিপিও শেষ! রবীন্দ্রনাথকে শোনানো হল, তিনি মুগ্ধ। খুব আনন্দের সঙ্গে উপস্থিত সবাইকে বললেন, "দেখলে সব বিষয়েই যথার্থ শিক্ষা ও সাধনা চাই।"

দেড়শোর বেশি রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি করেছেন সুরেন্দ্রনাথ, বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে সেগুলি।

তবে স্বরলিপিরও আগে আসে গান, গানের কথা ও সুর। বিষ্ণুপুরের সংগীতের ধারা স্পষ্ট ছাপ ফেলে গেছে রবীন্দ্রনাথের গানে।

রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের ছায়া

ধ্রুপদ শব্দটি এসেছে ধ্রুবপদ থেকে। ধ্রুব, অর্থাৎ শাশ্বত যে পদ, অর্থাৎ সংগীত। ধ্রুবপ্রবন্ধ বা প্রবন্ধগীতির ইতিহাস অতি প্রাচীন। মূলত আধ্যাত্মিক সংগীত, ঈশ্বরের বন্দনায় পদগুলি লেখা হত। পরে অবশ্য ঋতুবর্ণনা, রাজার প্রশস্তি এগুলিও ধ্রুপদের বাণীতে জায়গা করে নেয়। বিষ্ণুপুর ধারায় প্রবন্ধগীতির প্রচলন করেন আদিপুরুষ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। বৃন্দাবনের গুরুর কাছে শিক্ষা করেছিলেন মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় প্রচলিত গায়কি। মল্লরাজাদের আনুকূল্যে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা সে উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে যান। মল্লরাজারা বৈষ্ণব, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে ঈশ্বরসাধনায় নিবেদিত হয় বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ। এতে অলংকার কম, ভক্তিভাব বেশি। পশ্চিমভারতীয় ধ্রুপদের ঐশ্বর্য আর আড়ম্বরের তুলনায় বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদের শৈলী সাধারণী গুণসম্পন্ন, সংগীতের সরল ও অনাড়ম্বর রূপে ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন বাংলার নিজস্ব এই ধারায়।

তুলনায় পশ্চিমী হিন্দুস্থানী সংগীতের রীতির সঙ্গে তাঁর প্রাণের সংযোগ ছিল কম। ঠাসবুনোট কারুকাজ আর অলংকার ব্যবহারে অনুভূত হত সংযমের অভাব। তাঁর উপলব্ধিতে সংগীতে অতিরিক্ত অলংকার যেন প্রেয়সীর গায়ে স্যাকরার দোকান সাজানো। সর্বাঙ্গে গয়নার ঝলমলানি নয়, প্রেমিকের চোখ খুঁজে ফেরে প্রিয়ার অঙ্গে বাছাই-করা কয়েকটি অলংকারের শিল্পসুষমা, কখনো বা নিরাভরণ সৌন্দর্য। ব্যাপক প্রদর্শনী নয়, পরিমিতি ও সংযমেই শিল্প সার্থক হয়ে ওঠে। তাঁর সে অনুভূতি ধরা আছে বিশিষ্ট পন্ডিত ও অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে।

একবার দিলীপকুমার রায় বিখ্যাত উচ্চাঙ্গসংগীতশিল্পী কেসরবাই কেরকরকে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাবার জন্যে। কেসরবাই তখন ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত গায়িকা। তাঁর গায়কির নৈপুণ্যে, ফুলঝুরির মত তানকর্তবে মুগ্ধ গোটা দেশ। রবীন্দ্রনাথ শুনে বললেন, “এ’কে ভালো বলতে বাধ্য, কিন্তু ভালো লাগতে নয়।” (রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রালাপ, রবীন্দ্র রচনাবলী)

ধূর্জটিপ্রসাদ নিজে পশ্চিমভারতীয় রীতির মার্গসংগীতের সমঝদার, এহেন মন্তব্যে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। বিষ্ণুপুরী গানের অন্তর্মুখী, অনাড়ম্বর চালই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রিয়।

রবীন্দ্রসংগীত বরাবরই গানের মূল ভাবটিকে প্রাধান্য দিয়েছে। বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ ঘটেছে গানে, সঙ্গে সুপ্রযুক্ত মিড় ও সামান্য গমক – ঠিক যেটুকু দরকার সেটুকুই। বাহুল্য নেই, অলংকারও নেই, আছে সংযম, কথায় ও সুরে নিবিড় বন্ধন।

তাঁর তৈরী করা ব্রহ্মসংগীত, যা দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উপাসনাসভাগুলিতে গাওয়া হত, তা উপনিষদের বক্তব্যই তুলে ধরেছে। তার সুর বাঁধা হয়েছে রাগসংগীত দিয়ে, কিন্তু কালোয়াতিকে সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। অর্থাৎ গানের রস আছে কিন্তু খোসা নেই। সুর আছে, ম্যানারিজম নেই। রাগরাগিণীর ব্যাকরণগত বিশুদ্ধতা নিয়ে অহেতুক মাথাব্যথা নেই। আছে স্বচ্ছ ঝর্ণার মত বয়ে যাওয়া সুরের ধারা। আধ্যাত্মচিন্তা প্রাণ পেয়েছে তাঁর উপাসনার গানে।

ব্রহ্মসংগীতে গুরু যদুভট্টের প্রভাব তো আছেই, অনেক গান রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর ধ্রুপদ থেকে অনুপ্রাণিত। ধ্রুপদাঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত যেন বিষ্ণুপুরের চালে ঈশ্বরের উপাসনার গান। অন্তর্মুখী, বিমূর্ত। আত্মার গভীরে প্রবেশ করে তার বাণী।

সুরেন্দ্রনাথের সতীর্থ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্য সুবিদিত। কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (এখনকার কফি হাউস) তাঁর বক্তৃতার পর গোপেশ্বরের গান হবে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, “এতক্ষণ দাড়িশ্বরের বক্তৃতা শুনলেন। এবার শুনুন গোপেশ্বরের গান।”

সেই গোঁফওয়ালা সংগীতগুণীটি রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে প্রভাব ফেলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও উচ্চকণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করতে দ্বিধা করেননি।

উনিশশো আঠাশ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীতশিক্ষা প্রবর্তন করা নিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইল। কবি উপদেশ দিলেন, পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেই এব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি। সেইসঙ্গে বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে উল্লেখ করলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম।

তাছাড়াও ছিলেন রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি অ্যাকাডেমির ডিন, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র, রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র। মাঝে মাঝেই রমেশচন্দ্রকে ডেকে ফরমাশ করে ধ্রুপদ গান শুনতেন। যেটি ভালো লাগল তা চিহ্নিত করতেন। সেই ধ্রুপদটি অবলম্বনে বাঁধা হত নতুন গান। এ কাহিনি আমার গুরু সঙ্গীতাচার্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা।

কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ কেমন করে ছাপ ফেলেছে রবীন্দ্রসংগীতে, নিচের গানগুলো আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

১. বেহাগ রাগে "অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী" এসেছে একটি ধ্রুপদ থেকে। "কৌন যোগী ভয়ো, কানোমে মুদ্রা, অঙ্গ বভূতি লাগা বেরি পাওয়া" গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীতচন্দ্রিকা বইতে আছে। সুর হুবহু এক, কথাও কাছাকাছি।

২. সিন্ধু কাফি রাগের ওপর বাঁধা "চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ" গানটি এসেছে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ "মুরলি ধুন সুনি এরি মায়ি" থেকে। কথা ও সুর দুইই এক।

৩. শুদ্ধ ধৈবত-যুক্ত "চড়িবালি" পূরবী রাগে বাঁধা হয়েছে "বীণা বাজাও হে মম অন্তরে" যা আদতে বিষ্ণুপুরের একটি ধ্রুপদ "বিন বজাও মন লে গ্যয়ো"।

৪. শুধুমাত্র শুদ্ধ নিষাদ দিয়ে বৃন্দাবনী সারং রাগ গাওয়া বিষ্ণুপুর ঘরের বৈশিষ্ট্য। তামাম ভারতে বৃন্দাবনী সারং গাওয়া হয় শুদ্ধ ও কোমল দুই নিষাদ দিয়ে। শুদ্ধ নিষাদের বৃন্দাবনী সারং রাগে রবীন্দ্রসংগীত "জয় তব বিচিত্র আনন্দ" বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ "জয় প্রবল বেগবতী সুরেশ্বরী" গঙ্গাবন্দনার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়।

৫. কাফি রাগে "শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ" সুর নিয়েছে ধ্রুপদগীতি "রুমঝুম বরখে আজু বদরবা" থেকে।

রবীন্দ্রনাথের গানের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদগুলিও বিখ্যাত হয়েছে। নাহলে কেই বা আর প্রবন্ধগীতির খবর রাখে!

রবীন্দ্রসংগীতের যন্ত্রানুষঙ্গ – এস্রাজ

"রবিকাকা সুর বসাচ্ছেন, আমি এস্রাজে" – অবনীন্দ্রনাথের কথা। এটিই ছিল ঠাকুরবাড়ির পরিচিত দৃশ্য। ঠাকুরবাড়ির বেশিরভাগ সদস্যই এস্রাজ যন্ত্রটি বাজানোয় পারদর্শী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের চলমান বিশ্বকোষ। দিনু ঠাকুরের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল এস্রাজ। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান চলত এস্রাজ বাজিয়ে।

গানের সঙ্গে যন্ত্রানুষঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সতর্ক ছিলেন। গানের মূল ভাবটি যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে ছিল সজাগ দৃষ্টি। তালের জন্যে সহযোগী "আনদ্ধ" বাদ্য অর্থাৎ পাখোয়াজ, খোল, তবলার ব্যবহার ছিল। গানকে অনুসরণ করার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন "তন্ত্রীতন্ত্র", অর্থাৎ তারের বাদ্য। এস্রাজ ছিল তাঁর পছন্দের। হারমোনিয়াম ছিল অপাংক্তেয়। এর একটি সুনির্দিষ্ট কারণ আছে।

প্রবন্ধগীতি থেকে অনুপ্রাণিত ভাঙা গানই হোক বা মৌলিক গানই হোক, রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য হল শ্রুতির কাজ, যাতে একই স্বরের ওজনের পার্থক্য শ্রুতির তফাৎ গড়ে দেয়। অনুকোমল ও অতিকোমল শ্রুতি গানের কাব্যিক আবেদনটিকে বাড়িয়ে তোলে। স্বরবিতানে ধরা আছে শ্রুতিলিপি, অর্থাৎ ভারতীয় পদ্ধতিতে স্বরের ওজন। স্বরলিপির থেকেও এক পা এগিয়ে শ্রুতিলিপি। শ্রুতির নাটকীয়তা সবচেয়ে সুন্দর ধরা দেয় তারযন্ত্রে, যেমন সারেঙ্গী, এস্রাজ। সারেঙ্গীতে চাপল্য আছে, যা রবীন্দ্রসংগীতের ভাবের পরিপন্থী। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে এক ও অদ্বিতীয় অনুষঙ্গ এস্রাজ। বিশ্বভারতীর সংগীতভবনে শিক্ষার্থীরা গানের সঙ্গে সঙ্গে এস্রাজবাদনেও শিক্ষা পায়।

এস্রাজ বাজানোর এই বিশেষ ধারাটি আসে আরেকজন বিষ্ণুপুরী সংগীতগুণীর হাত ধরে। ইনি অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরের প্রজন্ম। তিনি শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনে এস্রাজের অধ্যাপক হয়ে যোগ দিয়ে আনলেন এস্রাজবাদনে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব স্টাইল। যা বিষ্ণুপুরী চালের প্রভাবে প্রভাবিত। শান্তিনিকেতনের যে কোনো নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানে এস্রাজ অপরিহার্য। যন্ত্রটিকে দাঁড় করিয়ে বাজানো হয়। এটি বিষ্ণুপুরী রীতি। ভারতের অন্যত্র এস্রাজ শিল্পীরা যন্ত্রটিকে কাঁধে ফেলে বাজান, অনেকটা বেহালার ধরনে।

অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বড় যত্নে বয়ে নিয়ে চলেছেন এস্রাজবাদনের সেই শৈলী। আজ এস্রাজ শুধু রবীন্দ্রসংগীতের সহায়ক যন্ত্রই নয়, একক বাদনের এক জনপ্রিয় যন্ত্র। এস্রাজে পূর্ণ সময়ের ডিগ্রি করা যায় বিশ্বভারতীতে।

শেষকথা

প্রথাগত শিক্ষা থেকে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই মুখ ফিরিয়েছেন। লেখাপড়ার স্কুলেই হোক, বা গানের স্কুলে, হাজিরা খাতায় তাঁর উপস্থিতি নগণ্য। তিনি স্বশিক্ষিত, পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধের কাছে পাঠ নিয়েছেন। বিখ্যাত গুণীদের সংগীতচর্চা তাঁর "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করেছে, সুরের আগুন লাগিয়েছে প্রাণে। সুর ও কথার মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধনেই তাঁর নিজস্ব সংগীতের ধারাটির জন্ম।

"আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল।" (প্রবন্ধ: আমাদের সংগীত)

পশ্চিমভারতীয় হিন্দুস্থানী সংগীতের রীতিতে কথার স্থান অতি সামান্য, সুরই প্রধান। কিন্তু বাঙালীর চিত্ত পিপাসিত গানের কাব্যসুধার তরে। কাব্যের সঙ্গে মিশে তবেই সুর সার্থক হয়। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদে অলংকারের বাহুল্যবর্জিত সুর ও কথার মেলবন্ধন, কীর্তন গানে পদাবলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে সুরের রাসলীলা – এ সবই রবীন্দ্রনাথের মননে স্পষ্ট ছাপ ফেলে গিয়েছিল। যার আত্মীকরণ হল বাইশশোরও বেশি গানে। আনন্দধারা বহিল ভুবনে, সংগীতের অমৃতরস উথলে পড়ল, অঞ্জলি ভরে পান করে ধন্য হলাম আমরা, প্রেমময় হল শূন্য জীবন, দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে, যুগে যুগে।

তথ্যসূত্র:

১. সংগীতচিন্তা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. ছিন্নপত্রাবলী – ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

৩. সংগীতচন্দ্রিকা – গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. গীতলিপি – সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রালাপ

৬. আলাপ-আলোচনা – রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায় (রবীন্দ্র রচনাবলী)

৭. বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয় – সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্দালক ভরদ্বাজ

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন।
গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা এল,
হেমন্ত-মন ফুরিয়ে আসার
বেলায় তবু, স্পষ্ট জানি –
রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে ছিলেন,
আছেন, সবার বুকের পাশে।

এক আকাশের প্রতিশ্রুতি
বীজের বপন, স্বপ্নহীনও
ক্লান্ত মাটির সেচের খালের
গতির মত, ক্লান্তিবিহীন।

শিয়ালদহে, হিউস্টনে,
বেকন বাড়ির জংলা বাগান
কলকাতাতে ঘিঞ্জি গলি,
কিম্বা সহজ প্রাণের খোয়াই –
একটা গোটা জীবন হয়ে
দাঁড়িয়ে আছেন
পথ দেখাতে।

রবীন্দ্রনাথ ও বেকন বাংলো: ১৯৩২ সালের ৩০ ডিসেম্বর স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের আমন্ত্রণে সাহেবের ইয়ং বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাজকর্ম দেখতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায়। শোনা যায়, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন কর্মধারার সঙ্গে হ্যামিল্টন সাহেবের কাজের মিল পেয়েছিলেন কবিগুরু। তাই এসে নিজের চোখে দেখে যান সাহেবের পল্লী উন্নয়ন। তাঁর আতিথেয়তায় বেকন বাংলোতে দু'রাতও কাটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কবির স্পর্শধন্য এই বাংলো অব্যবহার এবং পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় ধ্বংসের মুখে। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুন মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে কয়েক বছর আগে বাংলোর প্রাঙ্গনে একটি রবীন্দ্র মূর্তি ও বাংলোর চারিদিকে পাঁচিল তৈরি করা হয়। ইদানীংকালে সুন্দরবন নাগরিক মঞ্চ উদ্যোগী হয়েছেন এই বাংলোকে হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের মর্যাদা দিয়ে ওই ভবনে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত জিনিসগুলি নিয়ে একটি সংগ্রহশালা তৈরির এক শুভ উদ্যোগ নিয়ে। আশা করি অচিরেই সেই উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হবে। বছর দুই

আগে, গরমের ছুটিতে, সুন্দরবন যাওয়ার পথে গোসাবার এই বাংলোয় কিছুক্ষণ থেমে ছিলাম। আজ, বহুদিন পরে কম্পিউটারে বাংলোর বাগানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তির এই ছবিটি দেখে এ কটি লাইন লিখে ফেললাম। কবিতা নয়, ক্ষণজন্মা এই যুগপুরুষের এক অসম্ভব জীবনের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। আবার, বার বার।শুধু তাঁকে জানতেই তো গোটা কয়েক জীবন লেগে যায়। উনি এক জীবনে এত কিছু কি করে করে গেলেন? পারলেন, করতে?

সুত্রপঞ্জী

1. https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/hindusthan+samachar+bangla-epaper-hinsambn/rabindr+smriti+bijarit+bekan+banlor+behal+dasha+udasin+prashasan-newsid-101324751

2. http://archives.anandabazar.com/archive/1131126/26pgn3.html

"আমি সেই বিচিত্রের দূত। .... যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে, সুরে গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালো মন্দের দ্বন্দ্বে – তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই আমার একমাত্র পরিচয়।"

(আত্মপরিচয় /৪ সংখ্যক প্রবন্ধ)

অমর্ত্য দত্ত

পূজা

মন বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলবে তাঁকে ।
নেই তো কোনো কঠিন নিয়ম, রীতি ।
যেমন মাটি রোদের পরশ মাখে ।
মেঘের থাকে শ্রাবণে সম্মতি ।

তেমনই তোমায় জড়িয় নেবেন দেখো ।
জোছনা যেমন রাতের মনে বসে ।
হৃদয় পথে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডেকো ।
সেই আলোপথ ধরেই তিনি আসেন ।

অনুভূতিদের নৈবেদ্য রেখে,
অর্ঘ্য সাজাও ভালোবাসার ফুলে ।
প্রয়োজন নেই মন্ত্র এবং শ্লোকের ।
ঠাকুর আমার খুব খুশি এই পেলে ।

সুখের সাথে করছো যখন আলাপ
বা দগ্ধ হ'লে পোড়ার কথা শুনে ।
শুধু তিনিই বোঝেন আনন্দ ও জ্বালা ।
ঠাকুর তোমায় তোমারই মতো চেনেন ।

ভরিয়ে দেবেন, এমনই তিনি উদার ।
যা চাইবে সবই তুমি পাবে ।
ঠাকুর আমার স্রষ্টা ও তাঁর আধার –
ছড়িয়ে আছে অলীকে-বাস্তবে ।

পাওয়া না পাওয়ার হিসেব তোমার যত
ঠিক মিলে যায় মুহুর্তে অন্তরে ।
তাঁর ছোঁয়াতেই হৃদয় সঞ্চরিত .....
সব মিলিয়ে দিতে তিনিই শুধু পারেন ।

যতই মাখো, বাতাস কী আর ফুরায় ?
সেই তো জীবন শ্বাসেই মিশে থাকে ।
তাঁর পায়ের কাছে সময় এসে দাঁড়ায় –
অর্ঘ্য হাতে পঁচিশে বৈশাখে ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

ঈশ্বর সংলাপ

দুঃস্বপ্ন আসে, ডাকে রাত জাগা পাখি,
ত্রাস, মূত্র, কফে বিনিদ্র হয়ে থাকি

বিফলে বিষাদ তাড়াই বৃথা হাত নাড়িয়ে,
দেখি কোনো অস্পষ্ট ছায়া সামনে দাঁড়িয়ে,

ঠাহর হয়না তাঁকে ডাকি কোন নামে,
ইনিই কি ঈশ্বর ? এলেন মর্ত্য ধরাধামে ?

এত কষ্টের উপায় কি ? প্রশ্ন করি তাঁকে,
ঈশ্বর হাসেন মৃদু আর বললেন আমাকে,

"সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব,
কেবলই আঁখি দিয়ে,
আঁখির সুধা পিয়ে,
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব –
আঁধারে মিশে গিয়েছে আর সব"

কেন যে জানি'নি আগে, ফের বিচলিত হই,
ঈশ্বর বলেন, "খোলো, ওই তো মাথার পাশে বই"

দ্বিধা দ্বন্দ্ব কুণ্ঠাবোধে খুলে দেখি তাতে
বহু যুগ আগে লেখা সেই কবিতাতে

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"

ছায়ামূর্তি হেসে বলেন মিলিয়ে যেতে যেতে
"খুঁজে নিও আমায় ফের আগামীর সূর্যেতে"

স্তব্ধ হই, শব্দ নেই, ভাবি কি যে বলি,
হাত লাগে, চমকে উঠি, এ তো গীতাঞ্জলি !!

শান্ত হই, বুজি চোখ, ভাবি এ পোড়া দেশে
ঈশ্বরই এসেছিলেন হয়তো মানুষের বেশে।

সুজয় দত্ত

প্রশ্ন

রবিঠাকুর, রবিঠাকুর, সবাই তোমায় কেন
প্রণাম করে, মালা পরায় – সত্যি ঠাকুর যেন ?
সত্যি ঠাকুর অনেক আছে ঠাম্মা-দিদুর বাড়ী।
তাদের তো নেই তোমার মতো এত্তখানি দাড়ি ?
মা বলেছে তুমি নাকি মস্ত বড় কবি।
বই লিখেছ মোটা মোটা, আর এঁকেছ ছবি।
একখানা বই আমিও জানি – পড়ায় তো ইশকুলে –
কানমলা আর বকুনি দেয় যায় যদি কেউ ভুলে
"কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি", "ছোট নদী"র ছড়া,
"জল পড়ে আর পাতা নড়ে"র একঘেয়ে সেই পড়া।
জল তো পড়েই, স্কুলবাড়ীটার ছাদ ফুটো বর্ষাতে।
পাতা কেন – গাছ নড়ে যায় ঘূর্ণিঝড়ের রাতে।
জানো, আমার বাড়ী ছিল চূর্ণী নদীর পাশে ?
পাড় ভেঙে তার বন্যা এল, সব গেল সেই গ্রাসে।
এখন থাকি অন্য পাড়ায়, অন্যলোকের বাড়ী।
সেখানে সব দুষ্টু ছেলে – তাদের সঙ্গে আড়ি।
কেউ খেলে না আমার সাথে, একা একাই খেলি।
কঞ্চি বাঁশে ঝুলিয়ে সুতো পুকুরে ছিপ ফেলি।

তুমিও নাকি ছোট্টবেলায় দুষ্টু ছিলে খুব ?
মন ছিল না পড়াশোনায়, মারতে খালি ডুব
পাঠশালার ওই গারদ থেকে, কাটত খেলাধূলোয় –
গুরু সেজে বেত ঠ্যাঙাতে জানলার শিকগুলোয় ?
তারপরে সব বদলে গেল জাদুকাঠির ছোঁয়ায় ?
এমন বিরাট মানুষ হলে, সবাই মাথা নোয়ায় ?
ইচ্ছে করে বন্ধু হয়ে তোমার সাথে খেলি।
মনের যত দুঃখ আমার, তোমায় বলে ফেলি।
কিন্তু সবাই করতে শেখায় তোমাকে হাতজোড়,
তোমার ছড়া ভুললে পিঠে মার পড়ে খুব জোর।
ভাল্লাগেনা তোমায় তখন, রাগ হয়ে যায় মনে –
কিন্তু আবার রাতের বেলায় ঘুপচি ঘরের কোণে
অন্ধকারে একলা শুয়ে ঘুম আসেনা যখন,
কেবল ভাবি মা এসে খুব আদর করে কখন
ফিসফিসিয়ে বলবে ছড়া, জড়িয়ে ধরে শোবে –
"আকাশ জুড়ে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে"।
বলব আমি, "কার ছড়া মা ?"। মাথায় দিয়ে চুমো
মা বলবে "রবিঠাকুর। এবার সোনা ঘুমো।"

বিদিতা ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তী

তিনি আমার রবীন্দ্রনাথ

হয়তো মেঘলা আকাশ কালো
দুঃস্বপ্ন দেখাবে রাত,
হয়তো বেঁচে আছি ভেঙেচুরে
তবু হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ।

যখন স্মৃতিপট জোড়া আলো
ভাসা কেবল সুখস্রোতে,
জীবন বয়ে নিয়ে আসে ভালো
দাঁড়াই তোমার সামনে এসে।

যদি কিছুবা না ঘটে আজ
তবে কবিতারা জন্মায়,
প্রেমে আমরা ভুলেছি শোক
গানে ভয়কে করেছি জয়।

আজও জলতরঙ্গ বাজে
শুনি বাংলা মায়ের গান,
বুঝি পৃথিবীটা বেঁচে আছে
আছে বিশ্ব ভরা প্রাণ।

গাছে পাখি ডাকে ফুল ফোটে
বিপদে মানুষ বাড়ায় হাত,
আছে আকাশ জোড়া রবি
আর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ ।

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

বৈশাখের সেই পুরুষ ...

দীর্ঘ বরফের কাল যখন চরাচরে এঁকেছিল শুভ্রতা
শূন্যতার ধু ধু শিখিয়েছিল কান্নার জমাট বাঁধার রহস্য
হু হু হাওয়ায় অদ্ভুত বিষণ্ন বিধূর সেই তানেও তুমি ছিলে

তুমি ছিলে বসন্তের সমাগমে,তুমি ছিলে টিউলিপ রঙে
ঋতুর এস্রাজরঙ্গ বেজে ওঠে, তোমারই সুরধ্বনির আবাহনে
তুমি আছো ফাগুনের দোলরঙে ,তুমি আছো চৈত্রের ক্লান্ত ক্ষণে,
তুমি আছো কাঙালিনী মনের আঙিনায় দীর্ঘশান্তছায়াতরু হয়ে

তুমি আছো শব্দে ছন্দে আনন্দে,শুদ্ধস্বরের ভাটিয়ালী ভোরে ,
তুমি আছো বিষণ্ন মাঝদুপুরে,রাখালিয়া বাঁশির উদাসীন সুরে

ওগো দরদীয়া সাঁই,
ওগো খোয়াই পথের মাধুকর
তুমি এক শব্দের সুরের যাদুগর
তুমি আছো রাইয়ের প্রেমবিহ্বল ঘোরে
তুমি জান! অমিত লাবণ্যের নামে
আজও চিরকুটে ওড়ে!

তোমার স্যাফ্রণ রং আঙরাখা,
তোমার হাতে অচিনদুখের দোতারা,
সেই তুমিই বৌঠানের প্রাণভোমরা

তুমি ছুটি'র উদাত্ত আকাশ, অমোঘ তোমার গানের বাণী
নিজেকে হারানো দিনেও, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, যেন কোন অন্তরযামী
তোমার অলৌকিক আশ্বাসের ধ্বনি যেন জোনাকীস্ফুলিঙ্গে
অরূপআলো, জেগে থাকে হৃদমাজারের গোপন অলিন্দে

সুস্মিতা রায়চৌধুরী

প্রেমপর্যায়-প্লেটনিক, শারীরিক না রবিঠাকুর ?

"কি দেখিছ, বঁধূ মরমমাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি।
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি!"

কতবার ভালোবাসা যায় নতুন করে? কতোটা পথ হাঁটলে নতুন মানুষের সন্ধানে ভেঙ্গে দেওয়া যায় সমাজ-শৃঙ্খল ? কতোবারই বা বসন্ত রাঙ্গা হয় কবিতারা ? কতোবার স্পর্শ করতে হয় শরীর, ভালোবাসার দাবিতে ? না পাওয়ার দগ্ধতায় কতবার শুদ্ধ হয় হৃদয় ? আমি যতবার ভালোবাসার সংজ্ঞাটা খুঁজতে যাই, বারবার নিজেকে হারাই ঠাকুরের সৃষ্টিতে। রবিঠাকুর, "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা"। তাই হয়তো পরকিয়ার অন্তর্জালে কোনদিনই ক্ষতবিক্ষত হয়নি হৃদয়। বরং নতুন অনুভূতির গন্ধে আধুনিক হয়েছে চিন্তাশৈলি। ছুটে চলেছি অন্তহীন তবুও কলঙ্কভাগী হয়নি অন্তরাত্মা। এমন করে ভাবতে পারতো "রবিঠাকুরের" বাঙালি, কিন্তু বাস্তবে সত্যি কি সৃজনে সাজানো প্রেমের আম্রকুঞ্জ ? একঘেয়েমির প্রথা ভাঙতে বারবার প্রেমসুধা রসে নিমজ্জিত থেকেছেন ঠাকুর, প্রাণ পেয়েছে তাঁর কবিতারা। তবে কেন সংকোচে দগ্ধ এই সমাজ, ভালোবাসার জতুগৃহ ? কবিকে ভালোবেসেছি রাগে-অনুরাগে। কখনও লাল মাটির গন্ধে, কখনও বরফঠান্ডা আলতা পায়ে। দিনরাত বিভোর থাকা যায় যাঁর সৃষ্টিতে, সেই রবিঠাকুর। একটা দিন নয়, ডালভাতের মতন রবিঠাকুর জড়িয়ে রেখেছেন প্রত্যেকটি গভীর অনুরণন। কুণ্ঠাহীন, তীব্র, অবিনশ্বর এই ভালোবাসা বাধনহীন, লাগামছাড়া, উত্তাল, অধরা।

ঠাকুর, প্রেমের প্রশ্নে ছিলেন আদ্যোপান্ত বিশুদ্ধতাবাদী। প্রেমের ক্ষেত্রে শরীরকে তিনি বরাবরই গৌণ মনে করতেন। বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় তাঁর বিখ্যাত "সুরদাসের প্রার্থনা" কবিতায়। "হৃদয়-আকাশে থাক-না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি"। রোমান্টিকদের যে যে বৈশিষ্ট্য থাকে, তার সবই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল অত্যন্ত প্রকট। তীব্র কল্পনাপ্রবণতা, সুদূরের প্রতি আকর্ষণ, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ, প্রকৃতির প্রতি বাঁধভাঙা আকর্ষণ রবীন্দ্র প্রতিভার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্য ঠাকুরের প্রেমানুভূতিকে দারুণভাবে শাসন করেছে বরাবর। ফলে তাঁর কাছে নারীর প্রত্যক্ষ শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন হয়নি। বরং নারীর শারীরিক উপস্থিতিকে তিনি প্রেমের অন্তরায় বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, কাঙ্ক্ষিত নারী যখন কল্পনা থেকে বাস্তবের মধ্যে চলে আসে, কল্পনার অসীম থেকে সংসারের সীমার মধ্যে চলে আসে, তখন প্রেম আর থাকে না। আসলে চেনা পরিকাঠামোয় আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেননি তিনি তাঁর নিজস্বতাকে। কিন্তু কোথাও কি একটা ভুল হয়ে গিয়েছিলো বৌঠানের ক্ষেত্রে ?

ঠাকুরের জীবনে প্রেম এসেছিল নীরবে। সেই প্রেম সরব হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। তাই মৃণালিনীকে ভালোবাসলেও, বহু নারী এসেছে তাঁর জীবনে বিভিন্ন ভালো লাগায়। মারাঠি কন্যা আন্না তড়খড়, কাদম্বরী বৌঠান, আর্জেন্টিনার ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, ইন্দিরা দেবী এবং রবীন্দ্ররচনার গুণমুগ্ধ পাঠিকা হেমন্তবালা দেবী। ভালোবাসার উপসংহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলাদা।

যদি বলো পরকিয়া, তবে ভালোবাসনি তুমি কখনও। যদি বলো হৃদয়, তাও তো শরীর। কাউকে ভালোবাসতে একটা মুহুর্তই অনেক। বাকি সবটা গৌণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে বয়ঃসন্ধির সংবেদনশীল সেই দিনগুলোতে কাদম্বরী বৌঠান খুব বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন। কাদম্বরী দেবী ছিলেন তাঁর প্রথম খেলার সাথী, এরপর সাহিত্যের পথপ্রদর্শক, বন্ধু, প্রথম পাঠিকা ও সমালোচক, তাঁর পথের দিশারী। বৌঠানকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের স্থপতি। কিশোর মনে ছাপ ফেলতে বৌঠানের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। কাদম্বরী এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনে প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তাই

কিশোরী বৌদিটির সঙ্গে বালক রবির সম্পর্ক ছিল সৌখিন ও খুনসুটির। আবেগ, হিংসা, না ছেড়ে থাকতে পারার তীব্রতা সবটাই এই সম্পর্কের উৎস্য। দুজনের মধ্যে বোঝাপড়ার কারণেই দুজনের কাছে আসা। কিন্তু সমাজের চক্ষুশুল হয়ে ওঠে সবটাই। কারণ আজও চারুলতারাই নষ্টনীড়ের একমাত্র কারণ। বৌঠানের ইচ্ছেগুলোকে বাস্তবায়িত করেছিলেন ঠাকুর। কাদম্বরী প্রথম লিখতে শুরু করেন রবির উৎসাহেই।

কিন্তু এই নিঃসঙ্গ, রিক্ত নারীটির সাথে বন্ধুত্ব ঘিরেই ঠাকুরবাড়িতে আগুন জ্বলে ওঠে। ঠাকুরকে বিলেত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন তাঁর দাদা। আহমেদাবাদে পরিচয় হয় বিদূষী বুদ্ধিদীপ্ত, আন্নার সাথে। কবি তখন সবে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে। আন্না,এই মারাঠি কন্যা কবির কাছ থেকে ভালোবেসে একটি ডাক নাম চেয়েছিলেন। কবি “নলিনী” নামটি তার কাব্যভাবনা থেকে শুধুমাত্র তার জন্যই তুলে এনেছিলেন। মাত্র একমাসের এই সম্পর্কে কোনও সমাপ্তি ছিলো না, শুধুমাত্র রেশ লেগেছিলো ভালোলাগার। মুহুর্তের প্রেম বলে আজ যারা দোষী করেন বয়ঃস্বন্ধির ভাবনাকে, তারা কি কোনওদিন ভেবেছেন কতোটা সহজ-সরল হয় এই হঠাৎ ভালোলাগাগুলো ! ঠাকুরের নারীচরিত্রে এমন সরলতা দেখা যায় বারবার। কিন্তু বিলেতের গড়পড়তা পড়াশুনায় হাপিয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। তাই আবার ফিরে আসা বৌঠানের কাছেই। দীর্ঘ বিরহের পর কাদম্বরী দেবী তখন তাঁকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত। কাদম্বরী দেবী চাইতেন না, রবির লেখা সত্যিকার পরিণত হওয়ার আগেই, তা প্রকাশিত হোক, অন্য কেউ পড়ুক। এ যেনো শুধু তাদের দুজনার। বা হয়তো এভাবেই রবি শুধুই তাঁর অধিকার। তখন তার সাধের রবি, জগতের দরবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই আদরের দেবরের সাথে বোলপুর গিয়ে তিনি অনুভব করতে পারলেন পরিবর্তন। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা কমে না দুজনের। দুজনে মিলে ছাদের ওপরে তৈরি করলেন একটি বাগান “নন্দনকানন”। সেখানেই সময় কাটত দুজনার। দুজন পরস্পরের বন্ধু, পরস্পরের ভালোবাসা এবং স্বান্তনা। এই সময়ে কাদম্বরী-রবীন্দ্রপ্রেম তুঙ্গে । পুজোর সময় দুজন মিলে দার্জিলিং বেড়াতে যান। শুধু দুজন, নাকি জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ছিলেন, তা যদিও জানা যায়নি। কিন্তু এতো কিছুর পরেও তাঁর প্রেমে দেহের তুলনায় মানসিক এবং আধ্যাত্মিক যোগাযোগ ছিলো অনেক বেশি। তিনি বড়ো হয়েছিলেন ভিক্টোরিয়ান রুচির মধ্যে, তার সঙ্গে আবার মিশেছিলো ব্রাহ্মরুচি। কিন্তু অন্যদিকে প্রেমের সঙ্গে দেহের যোগাযোগ নেই এমন অসম্ভব কথাও তিনি বলেননি। শুধু রূপের মাপকাঠিতে তা বিচার করতে নারাজ তিনি।

বৌঠান রবির সবটা জুড়ে থাকলেও, সমাজ তা মেনে নেয় না। ঠাকুরের বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয় তখন। বিবাহসূত্রে জীবনে আসেন মৃণালিনী দেবী। যোগ্যতায় কোনওভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গিনী না হতে পারলেও, ঠাকুর আপন করে নেন তাকেও। ছাইচাপা আগুনে জ্বলতে থাকে বৌঠান। হারিয়ে যায় প্রিয় বন্ধু চিরকালের জন্য। কতোটা নিষ্ঠুর সমাজ যে কাদম্বরী দেবীকেই পাঠানো হয় ঠাকুরের পাত্রী নির্বাচনে। অসহায় ক্লান্ত কাদম্বরী দেবীর শেষ দিনগুলো অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে রোজ। আফিম পানেও সেই কষ্ট হয়তো ছিলো না, যা ছিলো নিজের মানুষটাকে অন্যের কাছে হারানোয়। শেষ হয় কাদম্বরী অধ্যায়। শুধু বেঁচে থাকে কবিতার পাশে অর্থপূর্ণ হিজিবিজিগুলো। আজ যারা রবিঠাকুরের গানে, কবিতায়, গল্পে নিজেদের পরিপূর্ণ করেন, তাদের আদালতেও কি বিচার পান বৌঠান ? না, গল্পের নায়িকাদের কষ্টটা বাস্তবে অশালীন।

কাদম্বরী দেবী মারা গেলেন, কিন্তু উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা বেঁচে থাকলো চিরকাল। কতো গান, কতো কবিতায় তাঁর এই ভালোবাসা ভাস্বর হয়ে আছে। সেই সঙ্গে একশত একান্ন বছর পরে কাদম্বরী দেবী আজও অমর হয়ে আছেন রবীন্দ্র-সাহিত্যে আর সেই সঙ্গে অমর হয়ে আছে তাঁদের রোমান্টিক প্রেমের ক্লাসিক কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা আর স্নেহের খিদে মিটিয়েছিলেন বৌঠান। সেই ভালোবাসার অভাব মৃণালিনী দেবী পূরণ করতে পারলেন না। বস্তুত, বন্ধু এবং সাহিত্যসঙ্গিনী হওয়া তো দূরের কথা বরং দৈহিক দিক থেকে খানিকটা আকৃষ্ট হন ঠাকুর মৃণালিনী দেবীর প্রতি। প্রশ্নটা এখানেই। আমি প্রেমের নাম জানিনা। কোনটা বৈধ, কোনটাই বা অবৈধ তা বিচার করে ভালোবাসার স্নিগ্ধতাটাকে বিসর্জন দিতে চাইনা। কিন্তু দুজনের সম্মতিতে ভালোবাসা বেঁচে থাকুক সেটা

চাই কারণ নাহলে যে পিছনে রয়ে যায় একা,তার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ঠাকুর কি শুনতে পেরেছিলেন বৌঠানের নির্বাক আর্তনাদ ? হয়তো পেরেছিলেন ঠাকুর। তাই শরীর আর আত্মার প্রার্থক্য করা যায় না তাঁর ভালোবাসায়। যাকে মন দিয়ে ভালোবাসবো তাকে স্পর্শ করার ইচ্ছেটা অশালীন নয় কখনই। প্লাটোনিক শরীরের মধ্যে জন্ম নেওয়া প্রত্যেকটা উদ্দীপ্ত উত্তেজনা ততোটাই তৃপ্ত যতোটা আত্মিক যোগাযোগ। ঠাকুরের সৃষ্টিতে শরীর সুন্দর। সৌম্য তার উপস্থিতি।

তাই বৌঠান চলে যাওয়ার পরেই পত্রমিতালি হয় ইন্দিরা দেবীর সাথে। এর কদিন পরেই মারা যান মৃণালিনী দেবী। মৃণালিনী মারা যাওয়ার পর তার অভাব নিশ্চয় অনুভব করে থাকবেন ঠাকুর। মাতৃহীন সন্তানদের বাড়তি দায়িত্বও পড়েছিলো তাঁর কাঁধে। কিন্তু তার স্মৃতি তাঁকে ব্যাকুল করতো এমনটা ভাবা মুশকিল। বৌঠানের জায়গা নিতে পেরেছিলো শুধু তাকে নিয়ে লেখা কবিতা, গল্পরা।

বুয়েন্স আইরিসে থাকার কথা ছিলো মাত্র কদিনের। কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ থাকায় ডাক্তার তাঁকে চিলি-সফর বাতিল করার পরামর্শ দিলেন। ভেবেছিলেন, চিলি থেকে শান্তিনিকেতনের জন্য কিছু টাকা যোগাড় করতে পারবেন। কিন্তু সে আশা বিসর্জন দিয়ে দু'মাস থাকলেন সেখানে। আমার ধারণা, সেখানে থাকার আরেকটা প্রধান আকর্ষণ ছিলেন ভিক্টোরিয়া। স্নেহে, যত্নে কবিকে আগলে রাখলেও ঠাকুরের ভালোবাসা তার প্রতি ছিলো উদাসীন। ভিক্টোরিয়া সম্ভবত কবির মন এবং দেহ উভয় প্রত্যাশা করেছিলেন। যেমন ছিলেন হেমন্তবালা। গুণমুগ্ধ এই পাঠিকাকে স্বভাবসুলভ গুণেই আপন করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু প্রত্যেকটি ভালোবাসারই কারণ ছিলো তাদের আলাদা বৈশিষ্ট। কিন্তু বৌঠানের সাথে সম্পর্কটা ছিলো শর্তহীন। পুরে গেলেও স্বীকার করা যায় যে সমালোচনা, কলঙ্কের পরোয়া না করে ডুব দিতে ইচ্ছে করে যার উষ্ণতায় সেই তো আসল ভালোবাসা। সমাজ একঘরে করে যাকে, সেখানেই জন্ম নেয় চারুলতারা।

পঁয়ষট্টি বছরের তাঁর প্রণয়-জীবনের দীর্ঘ পথ তিনি অতিক্রম করেছিলেন, ব্যতিক্রমী আধুনিকতায়। প্রথম জীবনে যে চার নারীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, তাদের সবার বয়সই, তাঁর চেয়ে বেশি। ছেলেবেলায় তাঁর যে মাতৃস্নেহের খিদে মেটেনি, সেই ঘাটতি হয়তো পূরণ করতে চেয়েছিলেন এসব নারীর ভালোবাসায়।

কিন্তু কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করার পর থেকে তার সেই প্রেমের চরিত্র পালটে যেতে আরম্ভ করে। বৌঠানের মৃত্যুতে যে ভয়াবহ শূন্যতা দেখা দেয়, তা পূরণের চেষ্টা করেন অপ্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত গ্রাম্য স্ত্রী মৃণালিনী আর একই বয়সী সুন্দরী, বিদুষী, বহু ভাষাভাষী, বিলেত ফেরত স্মার্ট ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা।

কোনটা সামাজিক এই প্রশ্নে শেষ হয়ে যায় অনেক আকাঙ্খা। আমরা কি সত্যিই রবিঠাকুরের মতন করে ভালোবাসাকে সাজাতে পারি?আমি বারবার একাত্ম হই রবি ভাবনায়। আজ পরিবর্তনটা খুব প্রয়োজন। পঁচিশে বৈশাখ, আর একবার জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের। প্রতিবাদ করতে শিখুক ঘরোয়া নিপীড়ন। ভেঙ্গে পড়ুক রুদ্ধশ্বাস মৌনতা। হতাশার রাতে জ্বলে উঠুক অনেক তারা। শীলমোহরে নয় হৃদয়ে নামকরণ হোক অনুভূতির। সমকামিতা, পরকিয়া নয় ভালোবেসে ভালো থাকার নাম হয়ে উঠুক রবিঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী, আধুনিক, মুক্তমনা। বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে আবার মুক্ত হয় ভাবনা। নিন্দাকে ঠেলে গ্লানি মুছে আঘাতে প্রতিঘাতে সুর তুলুক গীতবিতান।

আমার ঠাকুরের জন্য পলাশরাঙ্গা একটা প্রেমকাব্য লেখা থাকে, যেখানে লাল মাটির রাস্তা বৃষ্টি ভেজা পায়ে আকাশের নীল রং এঁকে দেয় সেখানেই তৈরি হয় বাঙালির "শান্তি নীড়"।

অলীক কল্পনায় বারবার এসে দাঁড়াই বেলজিয়াম কাচের রঙিন কারুকার্যময় নান্দনিক নকশায় নির্মিত উপাসনামন্দিরের সামনে। এগিয়ে যেতেই একটা সুন্দর গন্ধ ভেসে এলো নাকে। ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে তখন

শিউলিস্নাত আমার আচঁল। আম্রকুঞ্জের বাতাস লাগে শরীরে। পাঁচটি বাড়ি ঘিরে রাখে আমায়। উত্তরায়নে আমার রবিপ্রেম। ঈশান কোণে তখন মেঘ জমেছ আবার। একতারা আর সাঁওতালি ছন্দে, ইউক্যালিপ্টাস, অমলতাস গাছগুলির দিকে তাকিয়ে হেসে উঠি আমি।

বৃষ্টি নামে আবার। 'শুকতারা' 'অরূন্ধতী' পথ দেখায় রাতে। হাওয়াতে ভেসে বেড়ায় মিষ্টি-মধুর শব্দ, শীতল জলে ফোটে 'পদ্ম'। সবুজ বাগিচায় নীল ভোমরা গুন গুন গান গায়, বাতাসে আসে জংলী ফুলের সুবাস আর আশ্রয় পায় প্রেমবৈচিত্র। ফিরে আসি বারবার শান্তিনিকেতন, গোপন অভিসারে অপেক্ষায় থাকে শেষের কবিতারা।।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আধ্যাত্মিকতা

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন বাহাদুর কাঠ সেটিই যেটি নিজেও জলে ভাসে আবার অনেক মানুষও তাতে ভর দিয়ে ভেসে থাকতে পারে। তিনি আরও বলতেন জনক রাজার মতো হতে যিনি একহাতে কর্মের তরবারি ঘোরাতেন, আরেক হাতে ধর্মকে ধারণ করতেন। ঠাকুরের এই দুই উদাহরণের মূর্ত প্রতীক আমি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেভাবে খুঁজে পেয়েছি, সেভাবে খুব কম মানুষের মধ্যেই পেয়েছি।

আমার বারবার মনে হয় সেযুগে ও সর্বযুগে রবীন্দ্রনাথের মতো ধর্মের একনিষ্ঠ পূজারী খুব কম দেখা গেছে। আরেকটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য পরিস্কারভাবে বোঝানো সহজ হবে বোধহয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশের নামই ধর্ম। এবার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে আসুন। তাঁর একটি গান নিয়ে বরং আলোচনা করা যাক। গানটি অতীব জনপ্রিয় – "কতোবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া, তোমারি চরণে দিব হৃদয় তুলিয়া"। এবার বলুন এই গানটির চরিত্র কি? এটি কি ভালোবাসার গান নাকি ভক্তিগীতি? এর পর্যায় পূজা না প্রেম ? বলা কঠিন। এটিকে প্রেমিক এক দৃষ্টিতে দেখবে আবার পূজারী আরেক দৃষ্টিতে। সবচেয়ে বড় কথা দার্শনিকের দৃষ্টিতে আবার প্রেমিক ও পূজারীর দেখাটুকু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। আসলে নিবেদনের ভঙ্গি ও আকুতি প্রকৃত প্রেম এবং প্রকৃত পূজা দুয়ের ক্ষেত্রেই এতো কাছাকাছি যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে তাদের আলাদা করে ভাবা কঠিন। "আমায় যেসব দিতে হবে সে তো আমি জানি" – আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরে উন্নীত না হতে পারলে এ'কথা ভাবাও মুশকিল, লেখাও মুশকিল।

আসলে এই বিষয়টি অত্যন্ত গভীরভাবে লক্ষণীয়। ভালোবাসা ও পূজা – এই দুটির যে বাস্তবিক পৃথক কোনো সত্তা নেই, তা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও জীবনে বারংবার ধরা পড়েছে। ধরুন তাঁর জীবনের প্রেমের সম্পর্কগুলির কথা। কাদম্বরী বৌঠান এবং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো – রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই দুই নারীর অবস্থান ও উপস্থিতি একেবারে দুই প্রান্তে। একজন সূর্যোদয়ের সময়টি জুড়ে আছেন, আরেকজনের পদচিহ্ন সূর্যাস্তের মায়াবী বিকেলে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রচুর পরিবর্তন, প্রভূত উথাল-পাতাল ও ভাঙা-গড়া। কিন্তু প্রেমের প্রতি তাঁর জীবনদর্শনের একটুও বদল হয়নি। দুটি সম্পর্কেই ভালোবাসার মধ্যে খুব বড় কোনো কিছুর কাছে নিবেদনের এক আশ্চর্য দ্যুতি ও ভঙ্গি। কখনও মনে হয়না কামনা পূজাকে অতিক্রম করে প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। আরেকটি কথা। আঘাত, বিপর্যয় তাঁর জীবনে যেন সৃষ্টির সোপান। তিনি বলেছেন, "আমার বাঁশি তোমার হাতে, ফুটোর পরে ফুটো তাতে, তাই শুনি সুর, এমন মধুর, পরান ভরানো"। শৈশবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে যে আধ্যাত্মিকতার শুরু, এ' তারই ফসল।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-নাগরিকতা, বিশ্ব-মানবতার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এগুলি কোনোটিই তাঁর অর্জিতও নয়, আবার তাঁর উপর প্রক্ষিপ্তও নয়। এগুলি যেন জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর মধ্যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের মতো সঞ্চারিত, প্রোথিত। তাঁর বিবেকবোধ, তাঁর প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃতির বিশালত্বের সম্মুখে তাঁর নতজানু ভাব, এই সমস্ত কিছুই তাঁর অন্তরের সুগভীর আধ্যাত্মিকতাকে সূচিত করে। দুঃখ, বেদনা, ক্ষতি ও বঞ্চনাকে যে স্থিতধী ভঙ্গিতে তিনি গ্রহণ করেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। বলা যেতে পারে দুঃখকে তিনি আত্মস্থ করে যেন সৃষ্টির সদর্থক উদ্দেশ্যে সুচারু ভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই তো তাঁরই বলা সাজে – "বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন না করি ভয়" কিংবা "এই করেছো ভালো নিঠুর হে"। যেভাবে তিনি তাঁর মতামত, জীবনদর্শন ও কর্মে নিয়ন্ত্রিত আবেগের মাধ্যমে নিজেকে বিশ্বের কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন, যেভাবে আজও তিনি প্রাসঙ্গিক, তাতে শুরুতে উল্লেখ করা শ্রী রামকৃষ্ণের উদাহরণগুলি প্রতিনিয়ত সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাঁর জীবনে যে সত্যের তিনি চিরকাল একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন।

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখাটা কবিতার হাত ধরে। আমার এক কাকার ছিল ঝঙ্কৃত গলা। তাতে সব কথাই সা রে গা মা-র মত রিডে বাজত। তার গলায় "বীরপুরুষ" শুনে,বলাবাহুল্য তখন আমি বেশ ছোট, মনে হয়েছিল, আহা, আমার কথাটা কে এমন করে বলল!

"রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয়না আহা !"

তখন গল্পের বই পড়ার মারাত্মক নেশা ছিল। ফলে কল্পনায় অনেক দূরে নিত্য ঘুরি ফিরি, এবং সেসব কল্পনায় একটাই আক্ষেপ, ... "এমন কেন সত্যি হয়না আহা!"

# #

এর পরের গোলমালের সূত্রপাত ঠাকুমার কাছে গান শেখায়।

আমাদের গান শেখার সময় মন পড়ে থাকত হারমোনিয়ামের রিডে। ওই বড়সড়ো বাজনাটায় কেউ কি আমাদের হাত দিতে দেবে ? আমরা আদৌ গাইব কিনা জানার চেয়ে কখনও ওই হারমোনিয়ামটা বাজানোর সুযোগ পাব কিনা জানার আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। কখন কবে সে মুহূর্ত আসবে তার অপেক্ষায় বেড়ালের মত ওত পেতে, হারমোনিয়াম ঘিরে, তিনবোনে সারাক্ষণ বসে থাকি। তারই মধ্যে ঠাকুমা শেখান "তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে।"

সে গানের কথা সুরে তাই আচ্ছন্ন হতে পারিনা।

আমাদের মুখ গান গাইলেও মনে সে গান পৌঁছয় না। নাতনিদের হাবভাবে বেগতিক বুঝে ঠাকুমা গান পালটে দেন। "এসো শ্যামল সুন্দর" এর সুর ধরেন। হারমোনিয়ামের জগঝম্প বাজনায় নড়েচড়ে বসি তক্ষুণি। একই লোকের লেখা, সুর দেওয়া, অথচ ...। ঠাকুমা দ্রুত হারমোনিয়াম বাজান। গানের সুর, তার তাল লয়, বেশ লাগে। তারপরেই ঠাকুমা শোনান "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,ময়ূরের মত নাচেরে।" সে গানের সুরে একেবারে ভেসে যাই।

অনেক পরে বুঝেছিলাম "তুমি ধন্য ধন্য হে" বাক্যবন্ধটি দিয়ে কবি কাকে কিভাবে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। কত সুমধুর সে ভাষা। কত পরিশীলিত তার ভঙ্গি।

একজন মানুষের লেখাই তো। অথচ একেবারে আলাদা ! এই কথাটাই বুড়ো বয়স অবধি আমাকে তাড়া করে চলেছে। কীকরে হয় ? প্রতিটি গানে এক একজন আলাদা রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই আর বিস্ময়ে ভাবি, "তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,/আমি অবাক্ ...।"

আমার বরাবরের দু একটা বাছা রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে। যখনই মনখারাপ হয়, শনশন করে হাওয়া বয়, ঝড় উঠে সব ওলটপালট করে, আমি গাই আমার প্রিয় গান, "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরানসখা বন্ধু হে আমার।" কে এই পরানসখা ? সেকি মানব না দেবতা ? কত ভাবিয়েছে সে আমায় ! কত ঘুম না আসা রাতে দরজা খুলে ভেবেছি, ওগো খোলা হাওয়া, অন্ধকার আকাশ, মাথা দোলানো বড় বড় গাছেরা, তোমরা কি চেনো তাকে? সেই 'পরান সখাকে?'একবার, শুধু একবার আমি তাকে দেখতে চাই যে।

না। কেউ সাড়া দেয়নি কোন। তাই সে সন্ধান অন্তরে বাহিরে আজও চলছে।

প্রেম পর্যায়ের গানে কখনও শুনেছি "না, না গো না, / কোরো না ভাবনা –"

প্রেমের সে কথায় কী অপরূপ তারুণ্য! যেন পঁচিশের লাবণ্য ঝরে পড়ছে।আবার "নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে,ওগো অন্তরযামী," এ কথায় যেন প্রেম ,পূজা একাকার, প্রেম নিবেদনে অনায়াসে পূজার ফুল এসে মিশেছে!বড় বিস্ময় লাগে! কোথা থেকে আসে এমন ভাষা ? সুরে জাগে উপাসনার মন্ত্র!

কিছু কিছু কথাও বড্ড ভাবায় যে।"জাগরণে তারে না দেখিতে পাই, থাকি স্বপনের আশে – / ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয় বাঁধিব স্বপনপাশে।" মাথার মধ্যে গুনগুন করে একটা বেদনার ব্যথার করুণ সুর। না পাওয়ার ক্ষতে তা প্রলেপ দেয় কী ? আবার মনে পড়ে সেই লাইনটা, "যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে তাহারে আনিবে ডাকি।" মন বলে আছে, ভরসা আছে। সঞ্চয়ে বাসনার পলি জমে কোন দিন যদি ...। ওই যদির আশায় ...।

"দিবসরজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।"

একথা তো আমরাও ভাবি, এমন করে বলা ...। না দেখতে হচ্ছে। বাড়ির গীতবিতান ওল্টাতে ওল্টাতে দেখি আরও কত কত গানের মধ্যে কত বিচিত্র রসের ঝরণাধারা ! সে সুরধ্বনি যেন অনন্ত বাসর রচনা করেছে। আবার ভাবতে বসি। সত্যিই ভাবার কথা তো। এতসব গান ... ! সব ওনার লেখা ? সুর দিলেন কবে ? প্রতিটি বাণীর মধ্যে যেন অমৃতলোকের বার্তা ! সুরে কথায় মিশে সাতরঙের রামধনুর ছবি আঁকা হয়েছে, আমাদের মননের দেওয়ালে। যার জুড়ি মেলা ভার। কখন ও বা ভালোবাসায় টইটুম্বুর হয়েও এক অসীম জিজ্ঞাসা রেখে যান, "সখী, ভালোবাসা কারে কয় !" সত্যিই তো এই অনন্ত জিজ্ঞাসার কোন উত্তর আছে কি ?

সেই একই রবীন্দ্রনাথের গান । বয়স বাড়ে, অনুভব ঋদ্ধ হয়। নানা রঙে আঁকা দেওয়ালের ছবিটাকে প্রশ্ন করি, "তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।"

***   ***   ***

রবীন্দ্রনাথ কে যে কত ভাবে দেখা, কত ভাবে চেনা, বললেই ফুরিয়ে যাবে এমন তো নয়। আমাদের ছোটবেলায় সর্বসময় নাশা দূরদর্শন বস্তুটি ছিল না তো। নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক ছিল। তাতেই আমাদের ভুবন তার ডালপালায় ফুল ফোটাত, বাঁশি বাজাত।

বাড়ির ছাদে কাপড় মেলার দড়িতে মায়ের কাপড়ের পর্দা বানিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান করেনি এমন কেউ তখন ছিল কি ? ক্ষয়ে যাওয়া বেচারি মায়ের একমাত্র লাল লিপস্টিকে ঠোঁট রাঙিয়ে, মায়ের ব্লাউজ সেফটিপিনের সাহায্যে নিজের মাপমত করে নিয়ে, চেয়ে নেওয়া সিল্কের শাড়িতে, গেঁথে ফেলা বুনো ফুলের মালায় সাজুগুজু সেরে, আমরা যখন "খর বায়ু বয় বেগে" গানের সঙ্গে শরীর দোলাতাম, অদৃশ্য সেই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ছায়া আমাদের শরীরে মনে আশ্রয় নিত। সব অপূর্ণতা পূর্ণ হত নিমেষে।

ভুল হল বলায়, আশ্রয় তিনি নেননি, বরং দিয়েছেন অগাধ আশ্রয় জীবনের প্রতিটি বাঁকে। সবকটি রৌদ্রতপ্ত দিনে রচনা করেছেন শীতল ছায়া, মধুর মায়া।

***   ***   ***

আমার এযাবৎ পড়া সব গল্পের মধ্যেও মাথা উঁচিয়ে জেগে থাকে, 'অতিথি'র সেই দরিদ্র বালক। এই নিষ্করুণ পৃথিবী তাকে দিয়েছে দারিদ্রের পুরনো পোশাক আর রাজার রাজা বিশ্বদেবতা তাকে পরিয়ে দিয়েছেন নিজ ঐশ্বর্যের

অলীক মুকুট । তাই ধনীর ধন তাকে বাঁধতে পারেনি । রাজত্ব আর রাজকন্যার বাঁধন কেটে সে অনায়াসে বেরিয়ে পড়েছে পথে ।

ভারতীয় দর্শনের এপিঠে যদি থাকে 'অতিথি', অন্য পিঠে অনায়াসে ঠাঁই নেবে 'গোরা' । এ যেন নিজেকেই খুঁজে ফেরা, নিজের দর্পণেই দেখা নিজের মুখ । সব ধর্মের মূলে যে মানবশিশুটি চিরকাল খেলা করে, যে খেলায় সব ব্যবধান ঘুচে মানবতার জয়ধ্বনির অমোঘ মন্ত্র শোনা যায়, সেটিকে আত্মস্থ করেই ক্ষান্ত নন তিনি । উর্বর, অনুর্বর, সব জমিতে বীজ ছড়িয়ে আড়াল থেকে যে দেবতা দেখেন ফুল ফুটল না কাঁটা গজাল, ইনি তারই স্বরূপ । চিরকালের প্রণম্য ।

*** *** ***

তাই রবীন্দ্রনাথের কথা বলার আগে মনে হয় এই স্পর্ধা যেন সহনীয় হয় । রক্তকরবীর 'বিশুপাগলা'কে চেনা যায় । রাজার চেহারা থাকুক অমনি করেই গরাদের আড়ালে । তাকে নাই বা ছোঁওয়া গেল ।

নাভিদ সালেহ

আমার রবিঠাকুরঃ একজন নিগূঢ় পরিবেশবাদী

কবিগুরু যে প্রকৃতি প্রেমে মত্ত ছিলেন বরাবরই, তা নূতন করে বলবার কিছু নেই। ঋতুরাজকে সহসাই প্রণাম জানিয়েছেন, তার রঙ আর গন্ধে মেতে উঠেছেন অহর্নিশ। মৃদুহাসিতে ডেকেছেন মহারাজ বর্ষাকে: "এসো শ্যামল সুন্দর, আনো তবে তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা"। অনেক করে ভেবেছেন শরতের শেফালিকে নিয়েঃ "ওগো শেফালিবনের মনের কামনা ... ওই বসেছো শুভ্র আসনে, আজি নিখিলের সম্ভাষণে, আহা শ্বেতচন্দনতিলকে, আজি তোমারে সাজায়ে দিলো কে"। বসন্তের "পথিক হাওয়া"-য় আন্দোলিত হয়ে ফুলের প্রস্ফুটনে তাঁর প্রেয়সীর আগমনের প্রতীক্ষা করছেন: "মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন-দিনের স্রোতে"। তাঁর একান্ত নিবিষ্ট দৃষ্টিকে এড়ায়নি কিছুই। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন তিনি প্রকৃতিকে আস্বাদন করেছেন। কবিগুরু তাঁর প্রিয় নিসর্গ থেকে পেয়েছেন অনেক। প্রতিদানে কিছু দেবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিলেন যেন। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ইংরেজিতে দেয়া বক্তৃতা, "Robbery of the Soil", প্রকৃতি প্রতিরক্ষার একটি নীরব স্লোগান মনে হয়। আজ, প্রায় শতবর্ষ পরে, তাঁকে "নতুন করে পাবো বলে", বক্তৃতার এই অনুলিপিটি আমার হাতে পড়েছে হয়তো।

এ বক্তৃতাটি গ্রামবাংলাকে পুনর্গঠিত করবার জন্যে দেয়া হলেও, প্রকৃতি-রক্ষার আকুতি ফুটে উঠেছে একান্তেই। কবিগুরু শহরতলীর সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য, আর আতিশয্যে ক্লান্তি প্রকাশ করেছেন। পল্লী সমাজকে যেন শহরতলীর আমরা নিংড়ে নিয়েছি। তার সুফলা জমির ফলনে আমাদের ভান্ডার পূর্ণ করেছি অনায়াসেই। এ যেন একটি একমুখী সঞ্চালন। কর্ষণযোগ্য জমির অতি-ব্যবহার কখনও কি ভাবিয়েছে আমাদের? স্বচ্ছ বিলের মাছ নিধন কি বিচলিত করেছে আমাদের? গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সোনালী নদীর মৃত্যু একটুও অস্থির করেছে কি কখনও ? আমরা যেন নারীর মত ব্যবহার করেছি আমাদের প্রকৃতিকে। রবিঠাকুর বলছেনঃ "Like women, they provide people with their elemental needs, with food and joy, with the simple poetry of life... But when constant strain is put upon her through the extortionate claims of ambition, when her resources are exploited through the excessive stimulus of temptation, then she becomes poor in life. The city, in its intense egoism and pride, remains blissfully unconscious of the devastation it is continuously spreading." যখন ইমারতের ইট-পাথরের ভাস্কর্য, শহরে ভিড় জমানো ধনাঢ্য মানুষের লিপ্সা, আর বিবেকহীন পুঁজি-আহরণ সভ্যতার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, লাঞ্ছিত হয় মানবতা। নীতিহীন প্রগতির খোলসে যখন স্বাদ, ভোগ আর সম্ভোগে তুষ্টি আসে অভিলাষী মানুষে, তখন প্রয়োজন ফুরায় নারীর, প্রকৃতির। সভ্যতার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জলসাঘরের সাঁঝবাতির প্রয়োজন ফুরায়। কবিগুরু বলেছিলেন "Civilization today caters for a whole population of gluttons."

এই একতরফা দান আর কতদিন? কখন রুখে দাঁড়াবে নদীর জলস্রোত, থেমে যাবে ফাগুনের সমীরণ, হারিয়ে যাবে হিমবাহের ঘন নীল, আর উর্বরা মাটির ফলন-ক্ষমতা? কখন প্রিয়ার চোখের চকিত চাহনি হঠাৎ বদলে যাবে ক্রোধ-জমা অগ্নিদৃষ্টিতে? অতি শোষণের সময় ফুরিয়েছে। থেমে গেছে প্রবৃদ্ধির চাকা। থমকে গেছে শহরতলীর উন্মত্ত উচ্ছাস। বিচলিত সভ্যতার পাদপীঠে চিড় ধরেছে। দিশেহারা মানুষ গৃহরুদ্ধ হয়েছে। নিরুপায় চিত্ত প্রণাম ঠুকছে "শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ বেষ্টিত চরণে"। সময় কি অনেকটাই পেরিয়ে গেলো না। যে ক্ষত হয়েছে ধরিত্রীর শরীরে, তার অরোধ্য রক্তক্ষরণে কি মৃত্যু ঘটবে মানবতার? এ ভয়াল সময় যখন কেটে যাবে, বিস্মৃত আমরা কি আবার ফিরে যাবো চিরাচরিত নির্বুদ্ধিতায়? আমাদের চির আপন প্রকৃতিকে খড়্গ হাতে তাড়া করবো আমরা? সমৃদ্ধির সচল চাকা বিষিয়ে তুলবে নিসর্গের বায়ু, জল, আর মাটি? যেটুকু অবশিষ্ট, তা নিংড়ে নেয়া অব্দি শ্লথ হবে না প্রবৃদ্ধির গতি? বোধোদয় হবে না আমাদের: "যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি"।

সময় সত্যিই ফুরিয়ে চলেছে পৃথিবীর। দূষণে উষ্ণায়ন বাড়ছে। ধীরে নিমজ্জিত হতে চলেছে, যত্নে গড়া শহরাঞ্চল আর অবহেলিত গ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। নোনা জল ঢুকে পড়ছে ফলনশীল জমিতে। মাছেরা হারিয়ে যাচ্ছে। বন-নিধনে পুড়ছে বনানী। ঘরছাড়া বন্যপ্রানীকূল শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। পানিবাহিত অনুজীবের ক্রোধাগ্নিতে আহত গোটা সভ্যতা। এ আত্ম-নিধন থামাতেই হবে আমাদের। এ নৈসর্গিক রক্তক্ষরণ আর নয়। যে মানুষ মহাকালের খোঁজে চন্দ্রপৃষ্ঠে পা রেখেছে, দূত পাঠিয়েছে মঙ্গলগ্রহে, তাকে পারতেই হবে। যে মানব বাস্পকে কাজে লাগিয়েছে, বিদ্যুৎকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, জয় করেছে জলের শক্তিকে, তাকে পারতেই হবে। বিকল্প শক্তির খোঁজে বেরুবে মানুষ। জলকে করবে দূষণমুক্ত। হিমবাহের গলে যাওয়া রুখে দেবে উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের মাঝ দিয়ে। আমরা পারবো। আমাদেরকে যে পারতেই হবে। বসন্তকে ভালবাসবার সময় ফুরায়নি এখনো। বর্ষায় নিমজ্জনের সাধ এখনো জীয়ন্ত। প্রেয়সীকে আলিঙ্গনের প্রহর এখনো যে বাকি। “সেই সূরে সাগরকূলে বাঁধন খুলে, অতল রোদন উঠে দুলে, সেই সুরে বাজে মনে অকারণে, ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি”।

মৌসুমী ব্যানার্জী

ওদের রবীন্দ্রনাথ

মিতুলঃ মধ্যবিত্ত বাড়ির একটি মিষ্টি মেয়ে

আমি মিতুল। থাকি বাঘাযতীন'এ। যাদবপুর বিদ্যাপীঠে পড়ি ক্লাস থ্রি'তে।

এবার গরমের ছুটিতে আমি মা আর বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম রূপনারায়ণপুরে মাসির বাড়িতে। কি গরম রে বাবা ওখানে! সারাদিন হাঁসফাঁস অবস্থা, কিন্তু তার মধ্যেও আমি আর টুকাই সকাল বিকেল পাড়ায় পাড়ায় দৌড়ে খেলে বেড়িয়েছি। টুকাই আমার মাসতুতো ভাই, ও ক্লাস টু'তে পড়ে । মুখ লাল করে যখন আমরা বাড়ি ফিরতাম, তখন মা খুব একচোট ধমকে তারপর কাছে এসে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতেন, আর মাসি একটা বড়ো বাটিতে উঁচু করে অনেক তরমুজ এনে মা'কে বলতেন, "না সর, অনেক হয়েছে !"

আমার মাসির বাড়ির দাদু কি সুন্দর বাগান করেন ! বিরাট বাগান – আম, জাম, পেয়ারা গাছ, আর একতলার বারান্দার সামনে কেয়ারী করা ফুলের গাছ – হাসনুহানা, বেল, জুঁই, গোলাপ, কত কী ! সন্ধেবেলা এক একদিন যখন ঝুপ করে কারেন্ট চলে যেতো, তখন বাড়ির বড়, ছোট সব্বাই এসে বারান্দায় বসতাম আমরা। দাদু'র বাগানের জুঁই, বেলফুল, লেবুপাতা সব মিলেমিশে একটা গন্ধ, অল্প অল্প বাতাস, আর তারই মাঝে বড়দের টুকরো টুকরো কথা – "জানিস দিদি, পলাশের ছেলে তো এবার আমেরিকা যাচ্ছে বোস্টন ইউনিভার্সিটি'তে। ছোট থেকে কি যে ভালো ছেলেটা, সারাদিন বই মুখে বসে থাকতো।" ধুৎ, মা'দের যেন এ ছাড়া আর কোনো টপিক নেই! আমি আর টুকাই মাঝে মাঝে ছুট্টে গিয়ে পেয়ারা গাছের পাশের পাঁচিলটা ছুঁয়ে আসতাম, কার ভুতের ভয় কম প্রমাণ দেবার জন্যে।

আর এসবের মাঝে কোনো কোনোদিন রুমিপিসি গান গাইতো – "আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে" । ওমা, এই গানটা তো আমাদের স্কুলের প্রেয়ার'এ হয় ! টুকাই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, কিন্তু ও'ও দেখি জানে গানটা। আর সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, রুমিপিসির সঙ্গে আমি আর টুকাই যখন ধরি "এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে", আস্তে আস্তে দেখি বাবা, মেসো, কুণালকাকু, এমনকি মা আর মাসি পর্যন্ত পলাশমামা'র ছেলের কথা ভুলে গাইছে "আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব, সারারাত ফোটাক তারা নব নব, নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো ....।" গান থামলে দাদু বলেন – "বোঝলা মিতুলরানী, মন্দিরে যাওনের দরকার পরে না, অন্তরে বাহিরে রবি ঠাকুরের গান গাইলেই সব পুজা দেওন হইয়া যায়।" টুকাই হাসে, বলে "দাদু, তুমি ফানি ওয়ে'তে কথা বলছো।" আমি দাদুর কথা ঠিক বুঝতে পারি না, শুধু অবাক হয়ে ভাবি বাবা, মা, মাসি, মেসো, রুমিপিসি সব্বার স্কুলের প্রেয়ার সং একই ? আমি তো এতদিন ভাবতাম ওটা শুধু আমাদেরই গান .....।

মাম্পিঃ অতি বিচ্ছু, এটিচুডওয়ালা একটা ছেলে

আমার নাম মাম্পি। আমি দার্জিলিং ডন বস্কো'তে পড়ি। আগে কলকাতাতেই থাকতাম, এখন বাবার বিভিন্ন শহরে চাকরী, তাই আমি ডন বস্কোর বোর্ডিং স্কুলে যাই। আমার দাদু ঠাম্মি আলিপুরে থাকে। ঠাম্মি আমায় ভালোবাসে, কিন্তু দাদু খুব রাগী – হাইকোর্টের জজ ছিল তো, তাই সবাইকে খালি punishment দেয়। আমি ভিডিও গেমস খেললেই দাদুর বকুনি। আমিও তেমনি, পাঁচিলে বসে দূর থেকে দাদু'কে খুব জিভ ভেঙাই। দাদু আমাকে কি একটা কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি কবিতা শোনাতে এসেছিলো একদিন – একে তো পোয়েম'টা বেঙ্গলি'তে, তার ওপরে বইটাতে একটাও ছবি নেই। ধুস ! গরুর গাড়ি আমি চোখেই দেখিনি কোনোদিন।

আমার ছবি আঁকতে আর হার্ডি বয়েজ পড়তে খুব ভালো লাগে। আলিপুরে ঠাম্মির পাশের বাড়ির টুকটুকি, ও ক্লাস থ্রী'তে পড়ে, মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে। একদিন আমাকে এসে বললো একটা ঘোড়ার ছবি এঁকে দিতে। দিলাম এঁকে, – বিউটিফুল একটা দাঁড়ানো ঘোড়া। ওমা, তার পরেই বলে কিনা, ঘোড়ার ওপর ছোট্ট মানুষ বসাতে হবে, টগবগিয়ে চলেছে সে ঘোড়ায় চেপে! টেগোর'এর কোন কবিতায় আছে ছোট্ট ছেলে মা'কে নিয়ে চলেছে বিদেশভ্রমণে, ওর স্কুলের প্রোজেক্টে তার ছবি আঁকতে হবে। আমি তো রেগে কাঁই – দাঁড়ানো ঘোড়া অমনি বললেই ছুটিয়ে দেওয়া যায় ? ড্রয়িং'এর শুরুতে বলবে তো ! রুড বলে মুখ ভেংচিয়ে চলে গেলো। আমার ভারী বয়েই গেলো তাতে। আর এমনিতেই টুকটুকির সঙ্গে কোনো fun plan করা যায় না। আজকাল কিরকম girly girly ভাব। গত বছর winter'এ সেই চিড়িয়াখানার কেলেঙ্কারির পর থেকে ও একটু ভয়ও পায় আমাকে। বাঁদরের খাঁচায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছিলাম বাঁদরগুলোকে, ও-ও আমার দেখাদেখি করতে গেছে। ব্যস, কেলেঙ্কারি এক্সিডেন্ট ! আমি তো স্যাট করে আঙ্গুল বের করে নিয়েছি, গোদা একটা বাঁদর দিয়েছে টুকটুকির আঙ্গুল কামড়ে ! যা punishment দিয়েছিলো হাইকোর্টের জজ!

ডন বস্কো স্কুলটা খারাপ নয়, কিন্তু আমার কোনো ক্লাসেই মন বসে না except ডিয়াস স্যারের ইংলিশ ক্লাস। স্যার'কে আমার খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে ক্লাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ডিকেন্স'এর কথা বলতে বলতে মনে হয় উনি কি একটা অন্য ল্যান্ড'এ চলে গেছেন, dreamy England-এ vacant and pensive mood-এ daffodil খুঁজছেন। ডিয়াস স্যারের আরেকজন ফেভারিট পোয়েট টেগোর। আমি শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ক্লাসে উনি চোখ বুজে রিসাইট করেন "Where the mind is without fear, and the head is held high / Where knowledge is free / Into that heaven of freedom, my Father / Let my country awake." আমি ওই কবিতাটা খুব ভালো বুঝি না। ডিয়াস স্যার বলেন, "When you grow up my son, you will fathom Tagore." আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। আর ডিয়াস স্যার তন্ময় হয়ে বলতে থাকেন "Tagore is an ocean where time is spellbound, where nobody's dying, nobody's saying goodbye, life is like eternity, caught in a tree....." আমরা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করি।

আমার বন্ধু অমিতাভ, স্কুলের কাছেই ওর বাড়ি। একদিন ওর বাড়িতে ইনভাইট করলো। গিয়ে দেখি দাড়িওয়ালা ঠাকুরের সামনে ধূপধুনো দিয়ে পুজো হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কবিতা পড়ছে, গান গাইছে। অচেনা গান, কবিতা, তাও আবার in Bengali ! একটা ছেলে হঠাৎ "হা রে রে রে রেরে, ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে" বলে প্রায় আমার ঘাড়ে এসে পড়ছিলো। আমার টার্ন এলো যখন আমি galloping চালে বলে দিলাম "Faster than fairies, faster than witches / Bridges and houses, hedges and ditches / And charging along like troops in a battle / All through the meadows the horses and cattle / All of the sights of the hill and the plain/ Fly as thick as driving rain / And ever again, in the wink of an eye / Painted stations whistle by." ডিয়াস স্যারই পড়িয়েছিলেন কবিতা'টা। ট্রেন'এর জানলায় বসে লেখা। পোয়েট'এর নাম মনে পড়ছিলো না, টেগোর বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ'ই হবে নিশ্চয়।

একটা মেয়ে, যাকে আমার খুব ভালো লাগছিলো, খুব সুন্দর করে একটা কবিতা বললো; মনে হলো মা তার বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে hide and seek খেলছে। অমিতাভ'র মা প্যাস্ট্রি আর ঘুগনি খাওয়ালেন, আর নিজেও খুব সুন্দর গান গাইলেন "শিশু যেমন মা'কে, নামের নেশায় ডাকে ....." । গানটার meaning বুঝলাম না ভালো, শুধু বার বার মা'র মুখ মনে পড়তে লাগলো আমার।

অমিতাভ'দের গাড়ি যখন আমাদের কয়েকজনকে হোস্টেলে ড্রপ করতে যাচ্ছে, তখন কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না। জানালার বাইরে fog-এর দিকে তাকিয়ে খালি খালি ভীষণ রাগ হচ্ছিলো আমার দাড়িওয়ালা ঠাকুরের ওপর।

কচি: ভাসা ভাসা চোখের রোগা, কালো একটা ছেলে

আমার নাম কচি। থাকি শিয়ালদা'র কাছে। আমরা তিন বোন, এক ভাই – আমি'ই সবার ছোট, তাই আমি ইস্কুলে যাই। আমার বাবা পেপার মিলে কাজ করে। আমার এবার ক্লাস ফোর হল। ইস্কুলে যেতে আমার মোটেই ভালো লাগে না, মোটেই না। সারাদিন ডাঙ্গুলি আর লাট্টু খেলতে ভালো লাগে। আর ভালো লাগে মাটি নিয়ে খেলতে – শক্ত, নরম, কাদা, সবরকমের মাটি।

আমাদের ঘরে তক্তপোশের ওপরে দেয়ালে একটা ছবি টাঙানো আমার মায়ের, আর তার পাশে কাপড়ের ওপরে সেলাই করা ফ্রেমে বাঁধানো দুটো লাইন "মনেরে আজ কহ যে / ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।" দিদি বলে মা ওই সেলাই'টা করতে করতে শেষদিকে খালি শুয়ে পড়তো। আমি একদিন চুপি চুপি দেখেছি, বাবা মা'র ছবিটা'র দিকে পিছন ফিরে ওই সেলাইটা'র গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

আমাদের একটা সিঙ্গেল রীডের হারমোনিয়াম আছে। কোনো কোনোদিন পেপার মিলল থেকে ফিরে বাবা সেই হারমোনিয়াম'টা নিয়ে দাওয়ায় বসে। কি সুন্দর গান গায় বাবা – "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছে নয়নে নয়নে"। বাবা'কে যেন মনে হয় তখন ঠিক চিনি না – সারাদিনের কাজের ময়লা জামাকাপড় ছাপিয়ে কি সুন্দর আমার বাবা, আমারই বাবা। গান গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে হঠাৎ কাশির দমক আসে বাবার, আর দিদি তখন ছুট্টে গিয়ে জল নিয়ে আসে আর মাথায় ফুঁ বাতাস। কাশি থামলেই দিদির আবদার "ও বাবা, মা'র প্রিয় গানটা করো না"। আর বাবা জল খেয়ে ধরেন "শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে / তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে, বুকের পরে"।

গতবছর বাবা আমাদের নিয়ে হৈ হৈ করে রবীন্দ্রজয়ন্তী করলেন। আমার অনেক বন্ধুই এসেছিলো – বিপু, যতীন, কানাই, মন্টি। আমি দিদির একটা পুরোনো শাড়ী দড়িতে টানিয়ে সাজঘর বানালাম আর দাওয়ার চৌকির ওপরে বসিয়ে দিলাম ফ্রেমে বাঁধানো মা'র সেলাই। বাবা বললেন "পরের বছর একটা ভালো ছবি কিনবো রবি ঠাকুরের, বুঝলি ?" যতীন আর কানাই পাড়া ঘুরে ঘুরে ফুল তুলে অন্য আর ফ্রেমে বাঁধানো সেলাই'এর সামনে ছোট্ট থালায় আমরা সাজিয়ে দিলাম নকুলদানা, পাশে গেলাসে জল। দিদি আমাদের সাজসজ্জা দেখতে এসে আঁতকে উঠেছে – "এ মা ছি ছি! এই ঠাকুর নকুলদানা খাবার ঠাকুর নন রে।" এই বলে দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে অল্প দুধ ফুটিয়ে ছোট্ট একটা বাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য সুজির পায়েস নিয়ে এলো।

শাড়ীর ওপারে দাঁড়িয়ে বাবা আমাদের গোঁফ এঁকে দিলেন, ছোড়দি'র একটা লাল ওড়না মুড়িয়ে মাথার তকমা হলো – বিপু আজ হবুচন্দ্র রাজা, আর আমি তার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। যতীন যখন বিপুর পায়ের কাছে বসে শালপাতা দিয়ে জুতো সেলাই করার ভান করছে, তখন আমাদের দাওয়ার সামনে কত লোকের ভীড় ! কেউ উবু হয়ে বসে, কেউ বাচ্চা কোলে নিয়ে, কেউ আবার সাইকেল'এ যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর সব্বাই খিলখিলিয়ে হাসছে। নাটকের পরে মন্টির বোন টুসু, মা'র কোল থেকে খুব জোরে জোরে হাততালি দিলো। বাবার চোখে তখন ঝিকমিক করছে হাসি।

এ বছর আমাদের দাওয়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে কিনা ঠিক নেই। ঘুরতে ফিরতে দেখি বাবার শুকনো মুখ। দিদি আমাকে ফিসফিসিয়ে একদিন বলেছে, "একদম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি কিনে দাও বলে বায়না করবি না বাবার কাছে।" যতীন, বিপু আর মন্টিকে নিয়ে আমি বাড়ি থেকে দূরে খালের পারে গিয়েছিলাম সেদিন – আঁজলা ভরে তাল

তাল কাদামাটি তুলে এনেছি, বাজারের থলি ভর্তি করে। ছবি নেই তো কি হয়েছে ? আমি রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বানাবো। পাশে রাখবো ছোট্ট একটা গাছ, মনে মনে যার ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া যায়; আর একটা কাদামাটির নদী, মনে মনে যার স্রোতে দাঁড় ছপ ছপ নৌকা বাওয়া যায়। রবীন্দ্রজয়ন্তী হবেই। বাবার চোখে নিশ্চয়ই আবার ঝিকমিক করবে হাসি – বাবা তো বলেন রবীন্দ্রনাথ ওঁর সেই গাছ, আর সেই নদী।

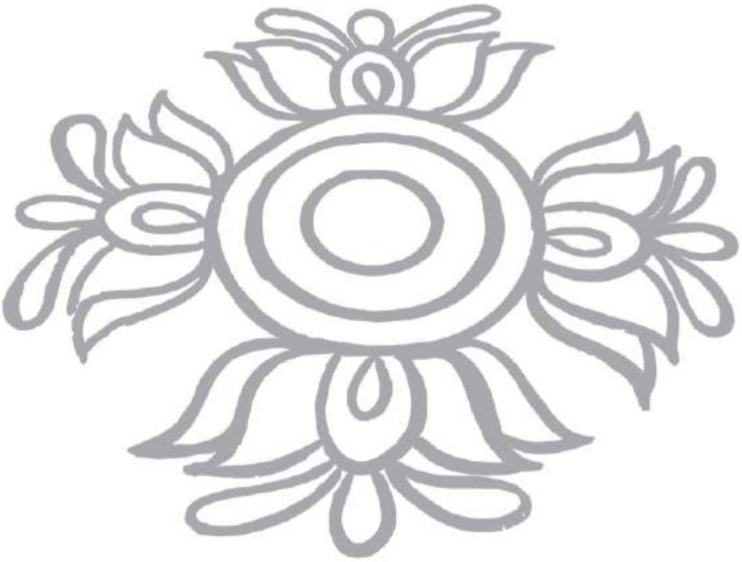

দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা

***

কাল রাতের বেলা গান এলো মোর মনে ।

ঘুমের মাঝেই গুনগুনিয়ে সুর দিলাম, স্বর দিলাম – এমনকি নাচের choreography ঠিক করলাম ।

সমস্যা হোলো ভোর বেলা, ঘুম ভাঙ্গার পরে ।

বুঝতে পারলাম যে স্বর, সুর সবই রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন বহু বছর আগে ! আমার সৃষ্টি ওনার বহু পুরাতন কৃষ্টি ।

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা, তোমায় জানাতেম ।

***

"এ মনিহার আমায় নাহি সাজে !"

গিন্নীকে বললাম মধুর স্বরে । এতো কষ্ট করে, বহু রকম বনফুল দিয়ে যখন মালাটা গেঁথেছে আমার জন্যে, তখন কি ভালো কথা না বলে থাকা যায় ?

আমি খুব practical লোক, তাই বললাম, বেশ নীচু গলায়:

"আহা, এতো পরিশ্রম করলে কেন আগাছার ফুল নিয়ে ?"

গিন্নী মুখ বেঁকিয়ে বললো, "আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান !"

***

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে ...

রবিবারের দুপুরে ভাত, ডাল, পটল ভাজা আর খাসির মাংস কব্জি ডুবিয়ে খাওয়ার পরে একটু ঝিমিয়ে পড়া বাঙালিদের চিরন্তন অভ্যাস ! আমিও সেই অভ্যাসের দাস হয়ে এক রবিবার আধ ঘুমে, আধ জাগরণে আকাশকুসুমচয়নে মগ্ন ছিলাম । বড় আনন্দ করে দেখছিলাম পাশের গলির সুন্দরী মেয়েটির হাত ধরে বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছি । খুব ইচ্ছা – ওর চোখে চোখ রেখে ওখানে কাফেতে কফি খাব আর ভাববো: যদি ডাগর আঁখি দিয়েছিলে ...

মা'র অনর্গল চীৎকারে বুঝলাম দিন গড়িয়ে সন্ধা আসছে । আমাকে সিঙ্গাড়া-বিস্কুট আনতে হবে, অতিথি আসছে দ্বারে ।

তরি ঘরি করে ছুটলাম কাফের দিকে । ও কি এখনো আছে কাফেতে ?

হয়তো সব পথ এসে মিলে যাবে শেষে তোমার দুখানি নয়নে ?

অদিতি ঘোষদস্তিদার

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ: প্রকৃতি নিজেই যখন চিত্রকর

'সমাপ্তি' সিনেমার প্রথম সিনটার কথা সবার মনে আছে নিশ্চয়ই। অপূর্ব ফিরছে গ্রামে। নৌকো থেকে নামতেই কাদায় আছাড়, আর মৃন্ময়ীর খিলখিল হাসি। লেখকের ভাষায়, 'তীর ছিল পিছল, ব্যাগসমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি – কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশথগাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।'

সেই অপূর্বর প্রথম মৃন্ময়ী দর্শন। সময়টা যদি শ্রাবণের শেষ না হত, নদীর ধারে কাদাও থাকত না, আর এমন একটি নাটকীয় দৃশ্যও দেখা যেত না।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি নিজেই এরকম ভাবে অন্তরালে থেকে চরিত্রগুলির নিরন্তর ছবি এঁকে চলে।

একজন শিল্পী মূল ছবি আঁকার আগে যেমন ক্যানভাসে বুলিয়ে নেন প্রাথমিক রং, যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলেন গোটা ছবিটি, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে রাখেন গল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতিই অলক্ষ্যে যেন নিয়ন্ত্রণ করে গল্পের চরিত্রগুলিকে, হাসায়, কাঁদায়, ভাবায়।

'সমাপ্তি'র প্রসঙ্গে ফিরে আসি আবার। গোটা গল্পে প্রকৃতি পাশাপাশি চলে দুটি মূল চরিত্রের। নায়কের কাছে নায়িকা আর প্রকৃতি আবার কোথাও যেন একেবারে একাকার। মৃন্ময়ীর হাসি শুনে অপূর্ব ভাবে, 'নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল।'

ভালোবাসা কখন যে মৃন্ময়ীর বুকে এসে বাসা বেঁধেছিল কিশোরী মেয়েটি বোঝেনি। দামাল চঞ্চলা মেয়েটি যেন রাতারাতি বড় হয়ে গেল। তারপর শাশুড়ির সঙ্গে ননদের বাড়ি যাওয়া। অপূর্ব জানেও না মৃন্ময়ী এসেছে। তীব্র অভিমান অপূর্বর বুকে। থাকবে না দিদির বাড়ি, মায়ের সঙ্গে দেখা করে রাতেই ফিরে যাবে মেসে।

গল্পে এবার প্রকৃতি নিজেই হাল ধরেছে দুটি তৃষিত হৃদয়ের মিলন ঘটাতে। অঝোরধারায় বৃষ্টি – প্রেমেরই বর্ষণধারা যেন। ফেরা হল না অপূর্বর, ঘরে ঢুকে আচম্বিতে মিলল পরম আকাঙ্খার ধন, মিলন চুম্বন ! মনে হয় প্রকৃতি যেন ফুলশয্যার রাতের আড়িপাতা চপল বধূটি। মুচকি হাসি তার মুখে। বৃষ্টি যদি অমন অঝোরধারে না ঝরত, হত কি এ রাতে 'অনেকদিনের একটি হাস্যবাধায় অসম্পন্ন চেষ্টা' র এমন মধুর সমাপ্তি !

এবার আসি বিশ্বসংগীতপ্রেমে পাগল এক বালকের গল্পে। 'অতিথি'র তারাপদ। 'হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ।'

এ গল্পে 'সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয়' – তাই সাংসারিক জীবনের জটিলতা তার আকাশের মত মুক্ত মনে ধরা পড়ে না, সে যেন 'নদী আপনবেগে পাগলপারা।'

নদী রয়েছে গোটা গল্পটা জুড়ে। নদীর কথা বারে বারে যেমন এ গল্পে এসেছে – তেমন আর কোন গল্পেই নেই ... নদী এখানে বিশ্বপ্রবাহ – আর তারাপদ সেই অসীম নদীর 'একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ – ভূত ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো বন্ধন নাই – সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।' প্রথম থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অবধি প্রায় নয় বার নদীর প্রসঙ্গ এনেছেন লেখক।

এক নববর্ষায় গল্পের শুরু, তারপর ধীরে ধীরে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নদীর রূপ পরিবর্তন। পরিবর্তন তারাপদর জীবনেও। শীতের নিস্তরঙ্গ নদীর মতোই তার সংসারে থাকা, ইংরেজি শেখা, চারুকে মানিয়ে নেওয়া। লেখকের ভাষায়, 'এই সংসারের পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত।'

কিন্তু আবার বর্ষায় যখন দুকূল ভেসে গেলো, গান ভেসে এল রথযাত্রার মেলার। তখন তারাপদর মনে উত্তাল ভাবনা,এ যেন 'সমস্ত জগতের রথযাত্রা – চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিতেছে।'

বর্ষায় তৃষিত বিরহাতুর যক্ষের মন উতলা প্রিয়ার তরে, কিন্তু তারাপদর প্রেম বিশ্বচরাচর জুড়ে, রাধার মত খুঁজে বেড়ায় তার শ্যামকে, জীবনদেবতাকে, দুজনের মাঝে জীবন তরঙ্গের গান!

'মাঝে নদী বহে রে, ওপারে তুমি শ্যাম, এপারে আমি', মনে পড়ছে অতিথি সিনেমার সেই বিখ্যাত গান। এ গানের মধ্যেও চলচ্চিত্রকার ধরেছেন লেখকের এই জীবনদর্শন।

বর্ষা প্রকৃতিই তারাপদর মনের সব বাঁধ ভেঙে দিয়ে তাকে মুক্ত করে জীবননদীতে ভাসিয়ে দেয়।

'মাল্যদান' গল্পের শুরু এক ফাগুনমাসে, 'পটলে'র ক্লান্তিবিহীন উচ্ছ্বাসে ভরা ফাগুনের অলস দুপুর, 'নয়নচুমে' ঋতু বসন্ত হাত ধরে যতীনকে নিয়ে যায় 'রূপকথার অলিতে গলিতে।'

যতীনের অভিজ্ঞ মন যখন বসন্ত প্রকৃতির 'কূজন-গুঞ্জন-মর্মরের পশ্চাতে' সংসারের 'ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখ' নিয়ে চিন্তায় ব্যাকুল, বসন্তের কুহুধ্বনি তখন কিন্তু কুড়ানির বন্যহরিণীর মত কোমল সরল মনটায় বুলিয়ে দেয় প্রেমের মধুর পরশ। আর সেই সোনার কাঠির ছোঁয়ায় কুড়ানির ঘুমন্ত মন রূপকথার রাজকন্যার মত একটু একটু করে চোখ মেলছে। কুড়ানি বুঝেও বুঝছে না, কিন্তু যতীন মালা হাতে নিলে তার মুখে ফুটে উঠছে 'একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা।'

যতীনের বিচ্ছেদ বড় বেদনার মত বুকে গিয়ে বাজে এই অবোধ কিশোরীর। 'কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা কিছু এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন', কিছুই বোঝে না সে।

কিন্তু পটলের সাংসারিক চোখে ধরা পড়ল সহজেই।

'ও পোড়ারমুখি, সর্বনাশ করিয়াছিস। মরিয়াছিস!'

কাহিনীর যবনিকা ঘটে সেই মালা নিয়েই। মৃত্যুপথযাত্রী কুড়ানি ভালোবাসার অমূল্য সম্পদ বুকে ভরে নিয়ে পৃথিবী ছাড়ে।

ফাগুনের অনুষঙ্গ গোটা গল্প জুড়ে। বার বার ঋতুর বর্ণনা। মিলনের মধুমাস ফাগুন, সেখানেই কুড়ানির সরল মনেও প্রস্ফুটিত প্রেম, কিন্তু যতীনের জটিল শহুরে মন নাগাল পায় না তার। চরম বৈপরীত্য। বাইরের প্রকৃতি নববসন্তের দানের ডালি নিয়ে যখন আনন্দে বিহ্বল কুড়ানির মনে ঘন শ্রাবণের মেঘ।

'কাঠবেড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা সুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে, এই খানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল; তাহারই মাঝখানে ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারি দিকের সংগত কোনো অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।'

কুড়ানির সেই ভালোবাসা যখন যতীন টের পায় তখন সে ভাবে নির্বোধের মত অবহেলা করেছে 'ফাল্গুনের একটি মধ্যাহ্নে একটি পূর্ণবিকশিত মাধবীমঞ্জরির।' কিন্তু ফাগুনের দিন তখন ফুরিয়ে গেছে – ভেঙ্গে গেছে বাঁশি – প্রিয়া তখন সুদূর নীহারিকা।

এখন যে গল্পটি নিয়ে আলোচনা, প্রকৃতি সেখানে জীবন নাট্যমঞ্চের এক একটি দৃশ্য এঁকেছে। ওই প্রেক্ষাপটেই গল্পের চরিত্রগুলির জীবনের ওঠাপড়া এসেছে অনিবার্যভাবে। গল্পের নাম 'মহামায়া'।

গল্পের শুরু এক মধ্যাহ্নে। মহামায়া যেন সেই দুপুরের মতোই উদাসী। উচ্ছল রাজীবের কোন আবেদনই যেন তার মনে সুর তুলছে না। সে অটল তার আজন্ম লালিত ধ্যান ধারণায়।

কিন্তু রাজীবের অচিরেই স্থান বদল হওয়ার খবর যেন মহামায়ার বুকে নিস্তরঙ্গ দুপুরের হঠাৎ বয়ে আসা উষ্ণ বাতাসের ঝড় তোলে, 'মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে।'

নিমেষে তখন সে রাজীবের সঙ্গিনী হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যায়। নিজের সিদ্ধান্ত নিজের প্রস্তরকঠিন দাদাকে জানাতেও একবারের জন্য দ্বিধাবোধ হয় না তার।

কিন্তু সমাজের কঠিন খাঁড়া নেমে আসে তার কাঁধে, কয়েকঘন্টার মধ্যেই অকাল বৈধব্য। রাজীব শুনে খুশিই হয়, কিন্তু পরক্ষণেই সব হিসেব গোলমাল করে দেয় মহামায়ার সহমৃতা হবার খবর।

গল্পের এই ক্লাইম্যাক্সে প্রকৃতি দৃশ্য বদল করিয়ে দেয়।

রাজীব যখন কোনদিক থেকেই কিছু সমাধান না পেয়ে অসহায় হয়ে ভাবে আত্মহত্যার কথা তখনই প্রবল ঝড় বৃষ্টি।

গল্পে প্রকৃতি উন্মোচন করে দেয় রাজীবের ভীরু মনটিকেও, যার প্রিয়াকে রক্ষা করার জন্যে আগে মনে পড়ে উদ্ধারকারী হিসেবে সাহেবের কথা। প্রকৃতির তান্ডবমূর্তির দিকে তাকিয়ে সে খানিকটা যেন নিশ্চিন্ত। দুর্বল রাজীব ভাবে, 'সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনোরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশপাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।'

প্রবল বৃষ্টিতে চিতা নিভে যাওয়ায় বেঁচে যায় মহামায়া। ফিরে আসে রাজীবের কাছে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্যে। মধ্যের ঘটনা বদলে দিয়েছে তার জীবনের অনেককিছু, কিন্তু সে রাজীবকে জানায়, 'কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি।' একসঙ্গে থাকলেও আড়াল করে রাখবে নিজেকে এই শর্তে রাজি হয় রাজীবের সঙ্গে থাকতে।

মহামায়া সঙ্গে থাকবে এই ভেবেই রাজীবের সুখ। 'তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিয়ো – আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আর আমি বাঁচিব না।'

বেশ কিছুদিন এমনভাবেই কাটল। কিন্তু এবার আবার প্রকৃতিরানি দৃশ্য বদলালেন চাঁদের আলোর বাঁধ ভেঙে দিয়ে।

লেখক নিজেই লেখেন, 'মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কি না বলা শক্ত।'

সেই মোহিনী জ্যোৎস্নামায়ার নিশির ডাকে রাজীব খুলে ফেলে মহামায়ার ঘোমটা, তারপর চিরদিনের মত হারায় মহামায়াকে।

দুটি নরনারীর জীবনের নিয়ন্তা যেন প্রকৃতি। নিজের ইচ্ছে মত পট বদলিয়ে টানাপোড়েনের ঝড় তোলে গল্পে।

এর পরের গল্পে প্রকৃতির ভূমিকা খুব সামান্যই, কিন্তু ভীষণভাবে জরুরি।

'মধ্যবর্তিনী' হরসুন্দরীর মত সাধারণ গ্রাম্য মহিলার জীবন ছিল অতি সাধারণ। বাইরের প্রকৃতি দেখা বা বোঝার সময় কিংবা ইচ্ছা কোনদিনই তার ছিল না. কিন্তু ফাগুন মাসে যখন সে পড়ল অসুখে, সেই রোগশয্যার পাশের জানলা দিয়ে দেখা বাইরের জগৎটা যে কত বড়, সে যেন প্রথমবারের মত উপলব্ধি করল।

'বাতায়নতলে শয়ন করিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতিমুহূর্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল ... হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না।'

এই বিরাটত্বের অনুভব দিশাহারা করে দিল হরসুন্দরীকে। তার ক্ষুদ্র মন সেই বিশালতার হাতছানিতে আত্মবিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তাই সে নিজেই তোড়জোড় করে স্বামীর আবার বিবাহের।

তার মনে এই উচ্ছ্বাস আনে বহিঃপ্রকৃতি। সাময়িক আবেগে ভেসে গিয়ে করে ফেলে এক বিরাট ত্যাগ। গল্পে লেখক এক বিমূর্ত ভাবনার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন, যা সম্ভব করেছে প্রকৃতি। এমন মনস্তত্ত্ব নিয়ন্ত্রক হিসাবে প্রকৃতিকে গল্পে ব্যবহার করা বিশ্বসাহিত্যে সত্যিই বিরল।

প্রকৃতির এই চিরন্তন লীলাখেলার কথা নিজেই লেখক প্রকাশ করেছেন 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে।

'সমস্ত আকাশরঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল।' এ যেন জীবনের ধানক্ষেতের রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা। জীবন আকাশের মেঘের ঘনঘটার ফাঁকে একঝলক রোদ্দুর শশিভূষণ আর গিরিবালাকে নানা ওঠাপড়ার মধ্যেও যোগায় বাঁচার রসদ, স্বাদ দেয় শাশ্বত আনন্দের।

কিন্তু শুধু মেঘ অথবা রোদ্দুর নয়, কখনও ঝড়, কখনও ফাগুনের মধুর সমীরণ বা পূর্ণ চাঁদের মায়া, আবার কখনও বা সামান্য এক শীর্ণ পুঁইমাচাও অলক্ষ্যে থেকে নানা ভাবে ওপরে আলোচিত গল্পের চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার সুভার জীবনে, 'প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়।' এ আর এক ভূমিকা প্রকৃতির। প্রকৃতিকে নিয়ে স্বকীয় ভাবনার এই অনবদ্য অনুভূতি গুরুদেব প্রকাশ করেছেন জীবনস্মৃতিতে, 'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে – তাহা কোন্‌-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা ... জীবনের বাইরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে,' – রবীন্দ্র গল্পে প্রকৃতি নিজেই আঁকছে সেই ছবি। প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের কাছে সুবিশাল দিগন্তব্যাপী ক্যানভাসের চিত্রকর হয়ে প্রকৃতি নিজেই ধরা দেয়, নিজেই হয়ে যায় গল্পের নির্ণায়ক! পাঠকের প্রাণ এমন অপূর্ব নির্মাণকার্যে বিস্ময়ে তাই বার বার জাগে।

তথ্যসূত্র ঃ গল্পগুচ্ছ ঃ https://tagoreweb.in/Stories/galpoguchchho-84

তপনজ্যোতি মিত্র

তীর্থযাত্রার পথ

নদীর জলে মাঝি দাঁড় বাইছিল, গোধূলির উদ্ভাসিত আলো এসে পড়েছে নদীর জলে, জীবনের সব অর্থ যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠছিল নদীর স্রোতে, ডানা উড়িয়ে কলরব করে দিগন্তের দিকে চলে যাচ্ছিল পাখিদের ঝাঁক, কোন দূর নিরুদ্দেশের দেশে তাদের যাত্রা ?

কবি ভাবছিলেন – এই কি সেই তীর্থযাত্রার পথ ?

যে তীর্থযাত্রায় সব বিলিয়ে দেয় মানুষ – তার জাগতিক সম্পদ, তার বিষাদকণা, তার অশ্রুকণা,

শুধু রেখে যায় একটুকরো অরুণ আলোর মত ভালোবাসা ?

কবি দেখেন একটি উদাস বালক হেঁটে যায় দিগন্তের মাঠের পারে, তার চোখে ভরে আছে পৃথিবীর কোন স্বপ্ন, কোন সোনালী দিনের স্মৃতি, কোন এক ধূসর পাহাড়ের চূড়া ।

সেই বালকটি কি সেই চূড়ার দিকে যেতে চায়, যেখানে যেতে চেয়েছে অনেক মানুষ ?

এই বালকটি কবির কাছে মাঝে মাঝেই আসে, এসে দাঁড়ায় তাঁর জানালায়, তাঁর দরোজায়, তাঁর বনভূমিতে, তাঁর দিগন্তপারের অরুণডাঙায়, তাঁর ঘুমে আর জাগরণে ।

কবি ভাবলেন কিছুক্ষণ – কে সেই উদাস বালক, কেন সে বার বার তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়েছে একটি করে রঙিন পাখির পালক ? কি নাম তার ? কোন দূর দেশ থেকে সে হেঁটে আসে ?

কবিও আছেন তীর্থযাত্রায়, প্রতিদিন এক মগ্ন ভোর থেকে শুরু করে আলোকভরা দিন পেরিয়ে দিনান্তের উদ্ভাসিত আকাশ আর গোধূলির পথেই তাঁর তীর্থযাত্রা ।

সেই তীর্থযাত্রার পথেই কবি রেখে যান – এক একটি অমূল্য মুক্তো, এক একটি সাধনার ধন – যা যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে থাকবে ।

সেই মণিমাণিক্যগুলো কবির বড় প্রিয়, বড় আদরের – কিন্তু সেই দ্যুতিময়, অবাক করা সম্পদগুলি তিনি ভাগ করে নিয়েছেন সকলের সঙ্গে, ছড়িয়ে দিয়েছেন সবার মধ্যে ।

মাঝে মাঝে আকাশ ভরে ঝড় ওঠে, তীব্র আবেগের মত নামে বৃষ্টিকণা, কখনো আসে একটি অপরূপ সুন্দর ভোর, আসে আবেগ উদাস করা একটি দিন, আর তখনই কবি গানের মূর্ছনায় ডুবে যান ।

আজ কি কবি গাইছেন – তোমার কাছে যে বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে ।

মরণ হতে জেগে ওঠা ? সে কেমন অনুভুতি ? সব হারানোর বেদনা বিলাপ ছাড়িয়ে কোন আলোক রশ্মি, কোন অপরূপ আলোকরেখা, কোন এক আলোক উদ্ভাসিত ভোরবেলা ?

কবির গান শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে প্রকৃতি – ঝড়, বিদ্যুৎ, বৃষ্টিপাতে হাজারো পাতা ঝরে যাওয়া অরণ্য, ধূসর জনপদ ।

কে গাইছে সেই মরণজয়ের গান, ভালোবাসার গান ? তার গানের সুরে ভেসে যাচ্ছিল দিগন্ত চরাচর, মুগ্ধতার আবেগ ঘিরে থাকছিল পৃথিবীকে, এ যেন বড় এক মায়াবী পৃথিবী, পৃথিবীর দিগন্তবিস্তৃত আকাশ ।

তখন কি নীলাঞ্জনের কোনও বাড়ির দরোজা খুলে এসে দাঁড়ায় সেই বালক ? বলে – কেমন আছ কবি ? কোন সেই চেতনার উদ্ভাসে তুমি লেখো কবি, সৃষ্টি করো হৃদয়জোড়া ভালোবাসার সেই হিরণ্ময় গানগুলি ?

হৃদয়জোড়া ভালোবাসা ? সে কেমন এক অনন্য অনুভূতি ? কেউ কি ভাবছিল, কেউ কি বলল – হৃদয় ছুঁয়ে কোন জনারণ্যের কাছে পৌঁছে যায় স্বপ্ন আর জাগরণ ?

জাগরণ ? মহা জাগরণ ? কোথায় ওড়ে ফিনিক্স পাখি, জেগে ওঠে সব অন্ধকারের বেদনা থেকে, করুণতা থেকে, ম্লানতা থেকে ?

কবি সেই বালকের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, সেই বালক তাঁকে বারবার বিস্মিত করেছে, শিখিয়েছে জীবনের অমূল্য অনুভূতিগুলি ।

এক টিলার ওপার থেকে হেঁটে আসে বালক । সেই টিলার ওপারে কি আছে – ভাবেন কবি । কী সেই অপার রহস্য মিশে আছে সেখানে, কী সেই গভীর গহন রহস্যমালা ?

আমাকে সেই টিলার ওপারে নিয়ে যাবে তুমি বালক ? – কবি মনে মনে জিজ্ঞাসা করেন ।

আমিও তোমার মত দুচোখ ভরে দেখতে চাই সেই রূপভাস, সেই মহাপৃথিবী, সেই আলোকচেতনা ।

নিশ্চয়ই একদিন যাবে কবি – তোমাকেই ত চাই সেখানে, তোমার কলমের স্পর্শে জেগে উঠবে ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা, অন্ধ ফিরে পাবে চোখ, বোবা ফিরে পাবে ভাষা, বধির শুনতে পাবে পাখিদের কলকাকলি, শুনতে পাবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানো মহাসংগীতের তান, সেতারের মল্লার ।

তারপর অনেকদিন সেই বালক আসেনি ।

কবি হাঁটতে থাকলেন – নদী পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, দিগন্ত পেরিয়ে সেই টিলার দিকে ।

টিলা পেরোতেই কবি দেখলেন এক দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, আর সেই সমুদ্র তীরে বসে আছে সেই বালক, এক গভীর মগ্নতা ঘিরে আছে তার মুখ, সেখানে এসে পড়েছে একফালি জ্যোৎস্নার আলো ।

বালকের চোখ ছিল বেদনা বিধুর, গভীর সমুদ্রের দিকে বিস্তারিত তার চোখ, গভীর সমুদ্রের মত তার দৃষ্টি ।

অনন্তকাল ধরে এসে আছড়ে পড়েছে ঢেউ সমুদ্রতীরে, বলেছে – আমরা আছি ।

কোথা থেকে আবেগের ঢেউ এসে প্লাবিত করে দেয় ভুবন, অনুপম ভুবনডাঙা, আবেগতলি, আকাশতলি ।

সে বড় এক মায়াবী পৃথিবী, রূপভাসের পৃথিবী, হাজার অরণ্যের পৃথিবী, আনন্দের পৃথিবী, উজ্জলতার পৃথিবী, দুঃখের পৃথিবী, হাহাকারের পৃথিবী, অশ্রুপতনের পৃথিবী ।

জ্যোৎস্না কাঁপছিল, কাঁদছিল, কোথায় গলে যাচ্ছিল হিমবাহ, কোথায় অজস্র মেঘের কান্নায় প্রদীপেরা থির থির করে কাঁপছিল, আলো কাঁপছিল, কোথায় বন্ধ হচ্ছিল জানালা দরোজা, কোথায় খুলছিল। কোথায় কবিতারা হয়ে যাচ্ছিল অরণ্যের ঝরা পাতা, কোথায় নদীর জলে মিশে থাকছিল তুষার গলা কান্না ।

কবির হৃদয় দুলে দুলে উঠছিল ।

অন্ধকারের গহন পেরোনো চেতনার অরুণ উদ্ভাসে জেগে উঠছিল মায়াবী পৃথিবীর হৃদয় মন্থন করা শব্দমালা, আবেগ মন্থন করা গান আর রূপময়, ঐশ্বর্যময় সব ছবি ।

অনন্ত সেই তীর্থযাত্রার পথ আলোক উদ্ভাসিত হয়ে থাকছিল ।

পারিজাত ব্যানার্জী

কাল্পনিক কথোপকথন

বৃত্তহীনা

– "দেখো লাবণ্য, কথা শুরু হওয়ার আগেভাগেই একটা হিসেব আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই। কারণ আমি জানি, তোমার যা তেজ তাতে নাতো শেষমেশ অর্থহীন হয়ে যাবো এই আমিই! তবু তুমি কিছুতে পোষ মানবে না।"

– "ভালোবাসলেই বুঝি পোষ মানতে হয় ? পোষ তো সামান্য ইঁদুরছানাকেও একটু যত্নআত্তি করলে ঠিক মেনে যায়! রাগ, অভিমান, হিংসে, কথা কাটাকাটি, অকারণ হইচই, ঝামেলা – এসব ছাড়া তো স্বয়ং রবিঠাকুরও ভালোবাসার গল্প লিখতেন না!"

– "আহ লাবণ্য! কথা ঘুরিও না! এখানে রবিঠাকুরের কথা আসছে কোথা থেকে? কথা হচ্ছে আমায় তোমায় নিয়ে, আর তুমি কি না অযথা ---"

– "অযথাই বটে! এই যে প্রতিদিন নিয়ম করে সূর্য ওঠে পুবের আকাশ লাল করে, কই আমরা কি দেখি, না ভাবি সেসব নিয়ে! রোজকার সব জিনিসকেই আমরা আসলে আলাদা করে আর গুরুত্ব দিই না তেমন, তা তাদের আমাদের জীবনে যতখানিই মূল্য থাকুকনা কেন! কেন জানো ? কারণ তা আমাদের কাছে অযথা রোম্যাণ্টিসিজম! আর এই যে আমি রবিঠাকুরকে নিজের ভূষণের পরম নিভৃতে আগলে অচিরেই হয়ে উঠেছি 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য – তুমি সেই বিলেতফেরত 'অমিত রে' হলেও তা বোধহয় টের পেতে না! কারণ, তোমার কাছে এসব দ্বন্দ্ব ভিত্তিহীন!

– "লক্ষীটি লাবণ্য, হেঁয়ালি বন্ধ করো। আমার ঢের কাজ এখনও বাকি পড়ে, তা কি জানো ? বাবা মুখে রক্ত তুলে দিনরাত এক করে আমাদের থেকে দূরে থেকে হলেও কাজ করে আমায় সবচেয়ে নামী এবং দামী স্কুল কলেজে কেন পড়িয়েছিলেন জানো ? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো। কাব্য করার জন্য নিশ্চয়ই না। মাথা তুলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কাজ করে উপার্জন করার জন্য। তোমার রবিঠাকুরের অনেক সময় ছিল – পয়সাপত্র জমিজমা, ঘরবাড়িও নেহাৎ কম তো কিছু ছিলই না, বরং বলা ভালো প্রয়োজনের থেকে বহু ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বেশিই ছিল। তাই পুর্ণিমার রাতে গঙ্গার বুকে ভাসতে ভাসতে পাতার পর পাতা ভরানো তাঁর পক্ষেই ছিল সম্ভবপর। এমনটাই যে হবে, তাতেই বা আর আশ্চর্য কি! আমার সে সাধও নেই, সাধ্যেও কুলোবে না আলঙ্কারিক কথা লিখে বেচে এই দুর্দিনের বাজারে চাকরি ছেড়ে দিয়ে দিন কাটানোর।"

– "তুমি ভুল জানো অমিত।"

– "লাবণ্য! আবার সেই ছেলেমানুষি? আমি অমিত নই, নিরঞ্জন।"

– "আচ্ছা বেশ। তোমার এই নতুন রূপকেই নাহয় নিলাম মেনে। যাগগে যা বলছিলাম, তুমি ভুল জানো নিরঞ্জন। তোমার বাবা তোমার জন্য রোজগার করেননি, বাড়ি থেকে অত দূরে গিয়ে বছরের পর বছর থাকেনওনি তোমাদের কথা ভেবে। তিনি তা করেছেন নিজের চাহিদা পুরণের জন্য, নিজের বেঁচে থাকার, মানে খোঁজার তাগিদে। তোমাকে যতটুকু ভালোবাসা দেওয়ার নিশ্চয়ই দিয়েছেন। তুমি তাঁর সন্তান, আত্মজ! তাঁর সারাজীবনের কামনা ভালোবাসার তুমি জীবন্ত ফসল! তা বলে তিনি কিন্তু তোমার জীবনী নিজে লিখতে পারেননা কখনই। সে অধিকার আমাদের কারোরই নেই। তুমি তোমার পরিবারে সকলের মধ্যে বেড়ে উঠলেও কখনও পুরোপুরি পরিবারের অন্য সকলের মতো হও কি? আইডেণ্টিকাল টুইনসরা-ই হয়না, তুমি তো কোন ছাড়! প্রতিটি মানুষের এক অদ্ভুত নিজস্বতা থাকে যা এমনকি বাবা

মায়েদের থেকেও হয় ভীষণভাবে স্বতন্ত্র। তাই তাঁরা অবশ্যই তোমায় ভালোবাসতে পারেন – কিন্তু তোমার জীবন, ভাবনা, ধারণা – এই সবকিছুর উপরে তাই বলে তাঁদের তোমার জন্য করা প্রতিটা কাজের দায়ের বোঝা কোনোভাবেই তাঁরা চাপিয়ে দিতে পারেননা।"

– "ছিঃ লাবণ্য! এসব কি বলছ তুমি ? মাঝদুপুরে অফিস থেকে দৌড় করিয়ে আনলে শুধু তোমার এই বাজে বকবক শোনাতে? তুমি পারলে এতটা স্বার্থপরের মতো কথা বলতে? অবশ্য, তোমাকে দোষই বা দিই কি করে? জন্ম থেকেই মা বাবাকে হারিয়েছো তুমি, আর কাকা কনভেন্টে রেখে পড়িয়েই তাঁর দায় সেরেছেন। যতদিনে বড় হয়েছো, সেই সম্পর্কও চুকেবুকে গেছে। তোমার পক্ষে তাই এই কথাগুলো বলা সহজ হতে পারে, কিন্তু আমার পরিস্থিতিতে দাঁড়ালে বুঝতে – পারিবারিক দায়বদ্ধতাকে এভাবে ফুৎকারে কোনোমতেই উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাঁদের সম্মান জানাতে এমন অনেক কিছুই আমাদের করতে হয়, যা হয়তো মন থেকে মেনে নেওয়া না গেলেও করতে হয়, কারণ সেগুলোই কর্তব্য।"

– "চক আছে তোমার কাছে ?"

– "চক? চক কোথায় পাবো? এ আবার কি হেঁয়ালি ? আমি কি স্কুলে পড়াই নাকি ? আর তাছাড়া আজকালকার নামীদামী স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ড কন্সেপ্টটাই উঠে গেছে। তার বদলে এসেছে হোয়াইটবোর্ড, আইপ্যাড এইসব!"

– "হবে হয়তো! তবে ওসব আবার আমার ধাতে সয় না। তাই তো মোবাইল কিনে নিজেকে সকলের সঙ্গে তাল মেলাতে আপ-টু-ডেটও করিনি আমি। যাগ্গে, চক না থাকলেও হবে। পেন হলেও চলত। তবে পেন হলে আবার পাতা লাগত বৃত্ত আঁকতে। চক থাকলে এই টেবিলের উপরের গোলটা আঁকতাম।"

– "কিসের গোল? কি বৃত্ত ? আচ্ছা লাবণ্য, তুমি কি কখনই কোনো কথা সোজা ভাবে বলতে পারোনা ?"

– "আরে, সোজা করে বলব বলেই তো এঁকে বোঝাতাম। দেখাতাম কেমন করে একটা বৃত্তের মধ্যে তুমি ঘুরপাক খাচ্ছ পুকুরের জমা জলে। সেখানে নড়তে চড়তে হয়তো পারো তুমি ঠিকই, সাঁতার, ডুবসাঁতার সবই হয় নিশ্চয়ই – কিন্তু দুকূল ছাপানো সমুদ্রের স্বাধীনতা সেখানে মেলেনা কিছুতেই। জীবন হয়তো ঠিক কেটে যায়, তবে ওই পর্যন্তই! ওই কাটিয়ে দেওয়া জীবনে বাঁচার রসদ মেলে না! আর এই যে তুমি পুরোপুরিভাবে বাঁচতে পারলে না, তোমার অনেক ভাবনা, কথা, ইচ্ছে, বাসনা মনের মধ্যেই রেখে দিলে পাথরচাপা দিয়ে সারাজীবন, এর ফলেই জন্ম নেয় খেদ। আসে সবকিছু না পাওয়ার হতাশা। আর তাই নিজের ইচ্ছে চরিতার্থ করতেই এই তোমরাই আবার পরবর্তী প্রজন্মের উপর চাপিয়ে দাও দায়। একটা শিশুকে বড় করার সমস্ত খরচের মাশুল চাপিয়ে দাও এই আগামী প্রজন্মেরই ছোট্ট দুটি কাঁধে। বৃত্ত হল না, কি বলো ?"

– "লাবণ্য ----"

– " আমার কথা শেষ হয়নি নিরঞ্জন। আমি কিন্তু অনাথ বলেই স্বাধীন নই। আমি স্বাধীন, কারণ কোনো শেকলের জোরেই আমায় বাঁধা যায় না। আর তাই আমি কোনো বৃত্তের দায়ে জর্জরিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে লাগামও পরাই না। ওই যে তুমি প্রথমে পোষ মানার কথা বলছিলে না, সত্যিকারের ভালোবাসায় জানবে, কখনও কাউকে পোষ মানাতে হয় না! সেখানে একটা মানুষের নিজস্ব তেজই তার শক্তি। আলো নিভে গেলে সেই মরা জীবনের কিন্তু কোনো মানে থাকে না। আসলে কি জানো, আমি বোধহয় বৃত্তহীনা। আমি সরলরেখা বরাবর খালি চলতে থাকি দিকশুণ্যপুরে – আমাকে কোনো শক্ত গিঁটেও এভাবে বাঁধা যায় না।"

– " যদি কোনো বাঁধনে আটকাতেই না চাও লাবণ্য, তবে আজ কিসের আশায় আবার ডেকে পাঠালে আমায় ? মনে আছে তোমার, এই তুমিই একদিন বলেছিলে এই দেখাকরাগুলো তোমার ভালো লাগে না। মনে হয় ভীষণ নিয়মমাফিক এইসব যোগাযোগের বাঁধন!"

– "মনে থাকবে না আবার? খুব মনে আছে। ধর্মতলা থেকে ট্রামে উঠেছিলাম দুজনে। সকাল থেকেই সেদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল। তার উপর ছাতা না থাকায় আমরা দুজনেই একেবারে ভিজে একসা। আমার শাড়ির আঁচলে কোনোরকমে নিজের মুখটা মুছে নিয়ে হঠাৎই বললে তুমি, 'চলো, এবার বাড়িতে কথাটা পাড়ি। অনেকদিন তো ঘোরাঘুরি হল। এবার বিয়েটা করে নেওয়া দরকার।' "

– "আর তাতে তুমি কি বলেছিলে মনে আছে ? বলেছিলে সম্পর্ক যতদিন লাগামছাড়া থাকে, ততদিনই ভালো। তাকে যেই ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় আগল তুলে দিয়ে আটক করে ফেলবে, অমনি সে দমচাপা পরে নাভিশ্বাস তুলে শেষবার সোপান ধরার তাড়া লাগাবে! কেন লাবণ্য, বিয়ে করে বুঝি সুখী হয়না কেউ? বেশি দূরে যেতে হবে না, তোমার আশপাশেই তাকিয়ে দেখো তো, কত বিবাহিত মানুষজন! এরা বুঝি সবাই অসুখী! আর তুমি লাবণ্য? আমায় না বিয়ে করে তুমি কি সুখ পেলে, বলো তো সত্যি করে আজ? আসলে তোমার মনে ধরেনি না আমায়? তাই সুখের এসব অদ্ভুত ধুয়ো তুলে সোজা কথা, পালিয়েছিলে সেদিন তুমি!"

– "ওমা! সুখের কথা আসছে কোথা থেকে? সুখের সাথে ভালোবাসার, স্বাধীনতার এসবের তো কোনো বিরোধ নেই। অবশ্য প্রয়োজনও তেমন নেই। সেদিন মনে আছে, আরও বেশ কটা কথা বলেছিলাম তোমায়। বলেছিলাম জন্তুজানোয়ার, গাছগাছালি – এদের কথাও। এরাও তো সবাই ভালোবাসে একে অপরকে। একসাথে থাকে। সন্তান প্রতিপালনও করে যথাসময়ে। কিন্তু তাই বলে একে অপরের ঘাড়ে কোনো দায় চাপিয়ে তারা কিন্তু কাউকে আটকেও রাখে না। সন্তানরা একটু বড় হলেই তাদেরকেও স্বাবলম্বী হওয়ার পাঠ শেখায় তারা। খুঁজে নিতে বলে তাদের ভিন্ন এলাকা। আবার, সন্তান জন্মেছে বলেই কোনো বাবা মাও কিন্তু একসাথে ঘর বাঁধে না। তারা একসাথে থাকে শুধুমাত্র তাদের যতদিন ইচ্ছে হয় ততদিনই। গাছেদের কথা ধরো তো, তাদের তো আরও ভালো – ফুল, ফল, পরাগ বা মুকুলের জন্ম দিয়েই তাদের কাজ শেষ। বাকি দায় সেই নতুন প্রাণের নিজেরই যে প্রকৃতির অন্য সব রসদের সাহায্যে খুঁজে নেয় তাদের বেঁচে থাকার আস্তানা। মৌমাছি, বোলতা, হাওয়া, আগুন, জল এসবের সাহায্যেই নির্ধারিত হয় পরবর্তী প্রজন্মের স্বাধীন অন্য আখ্যান।"

– "লাবণ্য, তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছো, আমরা মানুষ। সামাজিক জীব আমরা। তাই সমাজের চাপিয়ে দেওয়া নিয়মকানুনকে এভাবে এত সহজে উড়িয়ে দিতে পারিনা। অন্য পশুপাখির যা মানায়, গাছগাছালি যা করে, আমাদের সেটা করা বেমানান। অবশ্য তোমার সাথে তর্ক করা বৃথা। জানি, তুমি কিছুই বুঝতে পারবেনা।"

– "বুঝতে জানতেই যদি সবটা সময় কাটিয়ে দিই, তবে দেখব কখন, শিখব কখন বলো! এতদিন পরে ডেকে আনলাম, প্রাণভরে দুচোখ মেলে আগে দেখে তো নিই তোমায়!"

– "আচ্ছা লাবণ্য, একটা কথা আজকে বলোতো। তুমি কি সত্যিই কোনোদিন ভালোবেসেছিলে আমায়? নাকি এসব বৃত্ত স্বাধীনতা কিছু নয়, তোমার সবটাই মিথ্যে, ভাঁওতা! জানো, খবর রাখো তোমায় ছাড়া সেসময় কেমন কেটেছে আমার দিনগুলো? বাড়ির সবাই তোমার আমার কথা জানত। মনে মনে প্রস্তুতিও নিচ্ছিল আমাদের বিয়ের। আর তুমি কিনা ---"

– "আমি তোমায় ঠকাইনি নিরঞ্জন। আমার এই একতরফা চলতে থাকা জীবনের সঙ্গে যেই বুঝেছি, তুমি তাল মেলাতে পারবে না, অমনি স্পষ্ট তোমায় বলে দিয়েছি সব। আমি আবেগে চলি, ভাবনায় নয় – ভালোবাসার জন্য বারবার মরতে রাজি, মরার জন্য ভালোবাসতে নয়। যে কোনোরকমের বাঁধন আমার চলার গতিকে থমকে দিত, আর আমার এই চেতনার মৃত্যু হলে পর কোনোভাবেই আমি নিজের গড়া পথ ধরে আর মাথা তুলে বাঁচতে পারতামনা সেদিন। আর আমার সন্তানকেও গণ্ডির বাইরে রেখে এভাবে বড় করতে পারতাম না।"

– "সন্তান ? তুমি বিয়ে করেছো লাবণ্য ?"

– "এতক্ষণ আমার কথা শুনে এই বুঝি মনে হল তোমার! নাঃ নিরঞ্জন, সত্যি বলছি, তোমার নাম অমিত রায় হলেও কিন্তু সত্যিই খুব একটা আশ্চর্য হতামনা আমি। তোমায় ভালোবেসেও বিয়ে করলাম না অন্যকে না ভালোবেসে তোমার মতো ঘর বাঁধব বলে? আমার দ্বারা এজন্মে তা আর হবেনা গো!"

– "আমার উপায় ছিলনা লাবণ্য। বাড়ির একমাত্র ছেলে আমি। মা বাবা আত্মীয়স্বজন – সবার সমস্ত আশা ভরসা চিন্তার ভার বর্তাচ্ছিল আমারই উপর। বিয়ে করে ঘর বাঁধব, সংসার করব, ছেলেমেয়ে হবে,তারা বাড়ি জুড়ে খেলে বেড়াবে, দাদু দিদাদের হাত ধরে স্কুলে যাবে, পড়াশোনা করবে, অনেক বড় চাকরি পাবে বড় হয়ে -----"

– "দেখেছো তো, শুধুমাত্র আরেকটা বৃত্ত আঁকবে বলে কত সহজেই আমাদের তথাকথিত ভালোবাসার 'নিরঞ্জন' করে দিতে পারলে! সত্যিই, নামটা কিন্তু ভারী স্বার্থক তোমার! আমি জানতাম অবশ্য তুমি পারবে। আর ঠিক এই কারণেই সেদিন ট্রামে তোমার হাত ছেড়ে নেমে পড়েছিলাম মাঝরাস্তায়। আমাদের ভালোবাসার বীজ তখন একটু একটু করে বড় হচ্ছে আমার শরীরে। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, বিয়ে হলে আমার সন্তানকে শুধু আমার বা তোমার নয়, দায় নিতে হবে তার গোটা পরিবারের, এমনকি হয়তো সমাজেরও! ওই একরত্তি মেয়েটার উপর বড় বেশি চাপ হয়ে যেত গো সেটা, মা হয়ে তাকে এই বিপদে আমি কিছুতেই ফেলতে পারলাম না গো তাই।"

– "মেয়ে ? আমার মেয়ে !"

– "নাঃ। আঠারো বছর হয়ে গেল তো ওর গত মাসে, সেই মেয়ে তাই আর তোমার আমার কারও নয়, নিজের। ওর বৃত্তটুকু ভাঙার জন্য মা হয়ে সামান্য এই স্বার্থত্যাগটুকু করতেই হয়েছিল আমায়। সেদিন সত্যি বলছি, ইচ্ছে থাকলেও তাই ঘর বাঁধতে পারিনি তোমার সাথে মেয়েটার স্বার্থে। তোমার ভালোবাসা আমার অনাথ জীবনে যে একরাশ উন্মুক্ত বাতাস ভরে দিয়েছিল – তাতে ভেসে থাকার লোভেই উড়ে যাওয়া ছাড়া সে সময় আমার আর কোনো গতি ছিল না।"

– "তুমি, তুমি আমার মেয়েকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিলে এভাবে ? এতদিন পর তাহলে আজ আবার কেন ডেকে পাঠালে আমায় ? কি ভাবলে আমায় সব বললেই আমি ক্ষমা করে দেবো তোমায় ? জানো, যেই সন্তানের আশায় আমি বিয়ে করেছিলাম একদিন, সেই সন্তানের মুখ আমায় দেখাতে পারেনি শ্রাবস্তী। কত অপমান সহ্য করেছি আমরা! বাবা মা যখনই শুনেছেন আমার কোনো দূরসম্পর্কের ভাইবোন বা বন্ধুবান্ধবের ছেলেমেয়ে হচ্ছে, কষ্টে চুপ করে গেছেন। আর এখন তো পাকাপাকিভাবে শ্রাবস্তীর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে বাড়ির এবং পাড়ার মহিলামহল। প্রচণ্ড ডিপ্রেশনে ভুগছে ও আমার চোখের সামনেই অথচ আমার কিচ্ছুটি করার নেই। আমি মরছিলাম নিজের জ্বালায় এতদিন। ভাবোতো ঠিক কেমন লাগে যখন হঠাৎ তুমি জানতে পারো তোমার রক্তমাংসেই গড়ে ওঠা একটা মেয়ে অন্য জায়গায় বড় হওয়া সত্ত্বেও সবার কাছে সারাজীবন তুমি নপুংসকই থেকে যাবে !"

– "আর ঠিক এই কারণেই তোমার জীবন থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছিলাম আমি। তুমি জিজ্ঞেস করলে না, শ্রাবস্তীর জন্য কি করার ছিল তোমার ? যদি ওকে তুমি ভালোবাসতে পারতে সব রীতিনীতি, গণ্ডী, সমাজকে উপেক্ষা করে, তাহলে এ প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই পেয়ে যেতে। দুটো মানুষ বিয়ে করে একসাথে ভালোবেসে ঘর করার জন্য। সমাজের চাপে পড়ে তার দায় রক্ষা করে সন্তান উৎপাদনের জন্য নয়! একবার যদি পারতে মুখ ফুটে একথা বলতে, তাহলে আজ আর শ্রাবস্তী অসুস্থ হতো না। তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে লড়ত সকলের সাথে যেমন করেই পারুক।

তুমি সন্তান কেন চেয়েছিলে নিরঞ্জন ? নিজের বৃত্ত পূরণ করার দায়ে, তাই না ? সমাজ যাতে তোমার দিকে আঙুল না তোলে, বলে তুমি বেমানান, সেইজন্যই তো ? নিজে যা পাওনি, পারোনি, তার মধ্যে দিয়ে পাবে বলে তো ? আর আমি

বা শ্রাবন্তীরা কেন সন্তান চাই জানো, প্রকৃতির নিয়ম মেনেই তার উপর কোনো দায় না চাপিয়ে তাকে ভালোবাসব বলে। তাই তোমার বৃত্তে না চাইতেও সামিল হয়ে তোমাদের চাহিদার সাথে তাল মেলাতে না পেরে আজ তোমার স্ত্রী মানসিকভাবে জর্জরিত। বিশ্বাস করো এর দায় আমার বা আমার মেয়ে কারোরই নয়।

আরেকটা কারণেও সেদিন তোমায় বলিনি কিছু, কেন জানো ? কারণ তাহলে আমাদের ভালোবাসায় জন্মানো সন্তান তোমাদের তথাকথিত সমাজ থেকে অন্য তকমা পেত। সবাই তাকে বলত 'বেজন্মা'। সেটা মানতে পারতে তো ? পাশে দাঁড়াতে আমার? নাকি আমাকেই উল্টে বলতে গর্ভপাত করাতে ?

যাগগে, আজ কোনো অনুযোগ করব বলে ডাকিনি কিন্তু তোমায়। সব জানালাম, কারণ আজ আমাদের দুজনেরই বেলা পরে এসেছে। সেই দুপুরও নেই এখন, সেই তেজও হারিয়েছে প্রকৃতিরই নিয়মে তোমার এই বৃত্তহীনা। এই সপ্তাহেই কলকাতা থেকে পাকাপাকিভাবে মুক্তি নিয়ে চলে যাচ্ছি আমি আরেকটা গণ্ডি ভাঙতেই। তার আগে ভাবলাম, তোমায় দিয়ে যাই মেয়ের খবরাখবর – দেখো কথা বলে, যদি পারো তার এখনকার বৃত্তে নিজেকে মানিয়ে নিতে। এই ফাইলটা রাখো, এতে ওর বার্থ সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে সববয়সের ছবি, স্কুলের রেজাল্টের কপি, সব পাবে। ও সমস্তটাই জানে। তাই যোগাযোগ করলে খুশিই হবে সে, তবে না করলেও দুঃখ পাবে না। আর আমার উপর করে থাকা রাগের আঁচ যদি এখনও না নিভে থাকে, তবে তা কাগজে লিখে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিও। কেমন ? বয়স হচ্ছে তো, নিজের ভিতর তাই সব অভিমান চেপে রেখে তাই নিজেকে আর কষ্ট দিও না। উঠি, কেমন ?"

– "লাবণ্য, কি নাম তার ? কি করে সে ?"

– "ও, বলা হয়নি না! ও নিজের নাম রেখেছে 'কৃষ্ণচূড়া'। ছোটবেলায় ওর অন্য নাম রেখেছিলাম আমি, ও তা পরে পাল্টে নিল। কোনো পদবি অবশ্য কখনও দিই নি। ওটাও তো আরেকরকম বোঝা, তাই না?

এবছরই ও কলেজে ভর্তি হল, বটানি নিয়ে। সাথে আপাতত পার্টটাইম একটা চাকরি করে রিটেলশপে। তবে গাছপালা ভীষণ ভালবাসে ও। ছোটবেলা থেকেই ওর ইচ্ছে, বড় হয়ে বাগানের মালী হবে। গাছেদের পরিচর্যা করবে। প্রকৃতির বান্ধবী হবে। দেখা যাক কতদূর এগোতে পারে। ওর রাস্তা, ও এগোবে, ওকেই তো বুঝে নিতে হবে সবকিছু, তাই না ?"

অমৃতা মুখার্জী

ভাষার অহংকার

সকাল থেকে টিপটিপ আকাশের কান্নাকাটি শুরু হয়েছে। সুহানী প্রমাদ গুনল। এই রে ! টিপিকাল লন্ডনের কাঁদুনে ওয়েদার শুরু হল কি ? কাল পর্যন্ত তো সব চমকাচ্ছিল সূর্যের আলোয়। হই হই করে তারা দিব্যি ঘুরেছে বাকিংহাম প্যালেস, হাইড পার্ক, মাদাম ত্যুসো, শার্লক হোমসের বাড়ি।

আর আজ যেই না সেজেগুজে বেরুতে যাবে কান্ট্রি সাইড ট্যুরে, শেক্সপীয়ারের জন্মভূমি দেখবে বলে, আকাশের মড়াকান্না শুরু। কি অসভ্য ওয়েদার ? কোন কনসিডারেশন নেই ? মাত্র সাত দিনের ছুটি কত কায়দা করে, ঝুরি ঝুরি ঢপ দিয়ে বসের কাছ থেকে আদায় করতে হয়েছে। এখন সব না দেখে লন্ডন থেকে চলে যেতে হবে? ইয়ার্কি না মামাবাড়ী ?

টুপাই এর বাবা অমনি গজগজ করতে লাগল। "এই ঠান্ডায় বৃষ্টিতে ভিজে নিমোনিয়া হবে, মোটেই যাবনা, চল রে টুপাই আকোরিয়াম দেখে আসি।"

"লন্ডনে এসে কেউ আকোরিয়াম যায় ? সারা আমেরিকার ৫৬ টা আকোরিয়াম তোমাদের বাপ বেটির পাল্লায় পড়ে ঘুরেছি। সব রকমের কিম্ভুতকিমাকার জলের প্রাণী দেখে দেখে পিত্তি ঘেঁটে গেছে। মোটেই যাব না।"

বিপদ বুঝে টুপাই বলল "ও বাপি নিচে বাস প্যাঁক প্যাঁক করছে, চল উঠে পড়ি, যদি খুব রেনি রেনি হয়, বলব আমাদের ড্রপ করে দিতে আকোয়ারিয়ামে !"

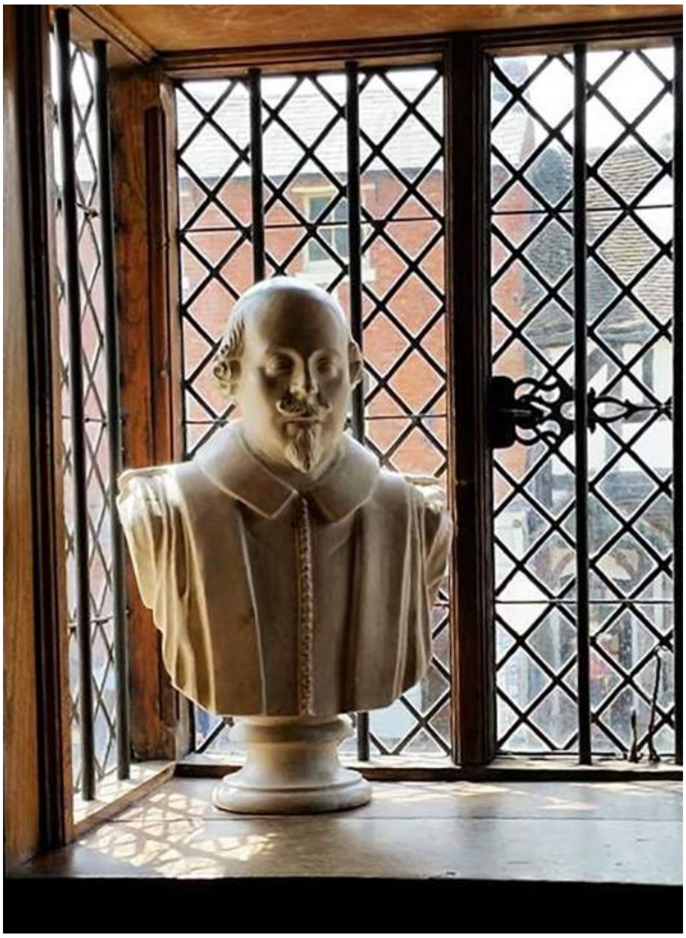

"হুহুম বললি যা হোক, বাস তো তোর মামাবাড়ীর, কন্ডাক্টেড ট্যুর রুট পাল্টে স্ট্রাফোর্ড ন আভন আর অক্সফোর্ড যাবার বদলে আকোরিয়ামে ড্রপ করবে।"

"বাসটা কাকার বাড়ীর হলেও সুবিধা কিছু হত না। নন রিফান্ডেবল টিকিট। জেঠু বলে কাঁদলেই ফেরত দেবে না।"

বাসে উঠে মন ভালো হয়ে গেল। বৃষ্টি আর খুব পড়ছে না। পান্না সবুজ প্রান্তর কেটে বাস চলেছে সাদা মরালের মত। গাইডের ইংরাজী উচ্চারণে যেন মধু বর্ষণ হচ্ছে কর্ণ কুহরে। আহা কি লাবণ্য ভাষার, মার্কিন দেশের চাষাড়ে কচকচি নয় গো ঠাকরান। এ হল রাজ ভাষা আর খানদানি বাচন ভঙ্গী।

সাদা, বেগুনি, গোলাপি ফুলে ছাওয়া প্রান্তর

পেরিয়ে বাস চলেছে অল্প পাহাড়ি পথে। শাদা ভেড়ার মখমলি বুটি দেওয়া সবুজ কার্পেট পেতেছে প্রকৃতি রাণী। টুপাই এর বাবা বেশ হাসি হাসি মুখে ঝপাঝপ ছবি তুলছে। যাক বাবা আকোরিয়ামের ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে।

গাইড ভারি রসিক। হেসে বললেন লন্ডনে প্লেগের গল্প সবাই জানেন। কি ভয়াবহ মহামারি তে কত লোক মারা গেছিলেন। কিন্তু প্লেগের চেয়েও ভয়ংকর মহামারি আজকাল দেখা দিয়েছে। সবাই হত চকিত হয়ে নড়ে চড়ে বসল। সে কি ? সে টা আবার কি ? গাইড আঙ্গুল তুলে দেখালেন। ম্যাকেডোনাল্ড রেস্টুরেন্টের হলুদ আর্চ। সারা ব্রিটেন ছেয়ে গেছে এই শস্তা আমেরিকান তেল চুবচুব খাবারে। নতুন রূপে নতুন প্লেগ। সুহানী ঢোক গিলল। এই রে তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না তো ? যে সে মার্কিনী সিটিজেন। কেলেংকারি !

লাল টুকটুকে গোলাপ, রংবেরঙের কসমস আর বেবি ব্রেথ ছাওয়া ছোট গ্রাম খানি। নদী বইছে কুলকুল।

১৬ শতকে ইংল্যান্ডের ওয়ারউইকশায়ারে জন্ম নেন বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। ৪০০ বছর পার হলেও তাঁর জন্মস্থান বিশ্বের নানা দেশের পর্যটকদের আগ্রহের কেন্দ্রে। প্রতিবছর লাখো পর্যটক ওয়ারউইকশায়ারে স্ট্রাটফোর্ড আপ-অন অ্যাভনে তাঁর জন্মস্থান দেখতে যান। অনেকের কাছেই এখনো জায়গাটি তীর্থভূমি।

গ্রিলের জানলার পাশে বসে রয়েছেন কবি নাট্যকার আজো। এত যুদ্ধ, রক্তপাত, রাজা গিরি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পৃথিবী ব্যাপী শোষণের ইতিহাস, কিন্তু সব ফেলে সবাই কবিকেই তো দেখতে আসে। কলমের কাছে হেরেছে তরবারি। টুপাই আর টুপাই এর বাবা সব ঘুরে ঘুরে দেখছিল। সুহানী যেন নড়তেই পারছিল না। তার কানে গম গম করে বাজছে ওথেলোর সংলাপ। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাগানের দিকে।

একলা নিভৃতে বাগানের সবুজ আঙুর লতার কুঞ্জ টির পাশে ও মা ! ও কে? ও কে? সুহানী র কি চিনতে ভুল হয়। তিনি আমার প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি। বসে আছেন সাদা দাড়ির ঈশ্বর। সারা পৃথিবীর লোক তাকে ও দেখছে, নমস্কার করছে। গাইড ফিসফিস করে বলল – "রানী মা নিজে বসিয়েছেন টেগোরের মুর্তি, টেগোর কে ছাড়া শেক্সপীয়ার ও অসম্পূর্ণ ।"

চোখের জলে দৃষ্টি গেল ভেসে। টুপাই অবাক হয়ে বলল "মা আর কারো না, শুধু টেগোরের ই স্টাচু ?"

সুহানী জড়িয়ে নিল ওকে।

"টেগোর নয়, বল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ফেরার পথে আকাশে একটা দারুন রামধণু উঠল। গাইডের ধারা বিবরণ ছাপিয়ে সুহানীর কানে বাজছিল "মোদের গরব, মোদের আশা ,আ- মরি বাংলা ভাষা।"

তার খুব আনন্দ হচ্ছিল গাইড তাকে মার্কিনী বলে ভুল করেনি। কবির দেশের লোক বলে চিনেছে।

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায়

সীমানা ছাড়িয়ে

রবীন্দ্রনাথ তো সমুদ্রের মতো ... কিন্তু আমাদের কাছে যেন ব্যক্তিগত সমুদ্র। যার পাড়ে বসে আমাদের নিজেদের সূর্যোদয় দেখতে পারি অথবা দূরের নৌকো, আকাশে উড়ে যাওয়া পাখির ঝাঁক। কেউ জল ছুঁই, আবার কেউ ডুব দিতে পারে। এমনকি কাছে যেতে না পারলে দূর থেকে ক্যালেন্ডারে ছবি দেখে সাধ মেটাই। সমুদ্র কিন্তু থাকে। আমাদের সাথে।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে বাংলা ছোট গল্পের ভক্ত। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়লো ছোটগল্পের একটি আসরে সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার বলছিলেন যে বাংলা সাহিত্যে সে অর্থে ছোট গল্প লেখা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। তার আগে ঠিক সেভাবে ছোট গল্প বলতে তেমন কিছু ছিল না।

ছোট গল্পের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে যে তিনি দিয়েছেন আমরা সবাই যেটা জানি। 'শেষ হয়ে হইলো না শেষ' সেটাই এখনো সবচেয়ে পরিচিত সংজ্ঞা।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প নিয়ে কথা বলবো আজ, তাই আবার বেশ কয়েকটি প্রিয় গল্পের কাছে ফিরছিলাম – তাদের মধ্যে একটা গল্প – ছুটি। আর কিভাবে যেন আটকে গেলাম ওই গল্পটার মধ্যেই ছোটবেলা থেকে ছুটি আমাদের অনেকের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিল।

গল্পের মূল চরিত্র ফটিক, যার বয়স তেরো চোদ্দ, দুষ্টুমিতে সারা গ্রামকে মাথায় তুলে রাখতো। বিধবা মা তাকে আর সামলাতে পারছিলেননা। নিজের দাদার সাথে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন। গ্রামে থাকা কিশোর ছেলেটি কলকাতার আকর্ষণে নিজের ইচ্ছেতেই, তার পরিবার গ্রাম সবাইকে ছেড়ে শিকড়চ্যুত হলো। ফটিক ঠিক সেই বয়সে ছিল, যার সমন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

'তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের মতো পৃথিবীর এমন বালাই আর নেই, শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না, তার মুখে আধো কোথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি।'

ফটিকেরও মামারবাড়ির পরিবারে, স্কুলে, আদর তো দূরস্থান, কোথাও সেভাবে জায়গা হলো না ... বেশিরভাগ সময়ে অনাদর আর অত্যাচারের মধ্যে আটকে গেলো সে। 'রবীন্দ্রনাথ বললেন – সেও বুঝতে পারে পৃথিবীতে কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না, আপনার অস্তিত সমন্ধে সে লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে থাকে'।

এই চার দেওয়ালের মধ্যে আটক পড়া কিশোর হাঁপিয়ে উঠলো তার রোজকার জীবনে, তাকে তখন দু হাত বাড়িয়ে ডাকতে শুরু করলো তার ফেলে আসা ছেলেবেলা, গ্রাম, বন্ধুর দল নদী আর তার 'অত্যাচারিনী অবিচারিনী মা'। মা'র কাছে যাবার জন্য তার সমস্ত অস্তিত্ব ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সে আর কারোর কাছে যেতে পারলো না ..., কাউকে সে নিজের কথা বলতে পারলো না। এরপর ফটিকের অসুখ করলো, সে অসুখ আর সারলো না ... অভিমানের বোঝা বুকে তলিয়ে গেলো। তার ছুটি হয়ে গেলো।

কিন্তু এই গল্পটা পড়তে পড়তে আমার একজনের কথা মনে পড়লো।

আমি তখন পড়াতাম বা বিশেষভাবে সাহায্য করতাম একটি হাই স্কুলে, যেই টাউনে সেন্ট্রাল আমেরিকা থেকে আসা কমুনিটির ছাত্রছাত্রীরা, যাদেরকে এখানে হিস্পানিক বলা হয়। বেশ গরীব এই শহর, হাই স্কুলের বেশির ভাগ

ছাত্রছাত্রীরা নানাধরণের কাজ করে। আমি ছোট গ্রুপে এদেরকে পড়াতাম, স্টেটের একটি পরীক্ষায় পাস করানোর জন্য। অমনোযোগী, দুষ্টু, অবাধ্য ছাত্রছাত্রীর অভাব ছিল না। সিজার মাঝপথে এসে ছোট গ্রুপে অঙ্ক করতে; ছ সাত মাস আগে সে ডোমিনিকান রিপাবলিক থেকে এসেছে। ওপরের তিনটি গুনের সব কোটায় তার আছে; তার সাথে আছে একটা গোঁয়ারতুমি, ঔদ্ধত্য। সে যখন একা আমার কাছে এসেছে, কথা বলার অবকাশ পেয়েছি। জানতে পেরেছিলাম সে মা, ভাইবোনদের ছেড়ে এখানে বাবার সাথে থাকে, যাকে সে খুব ভালো চেনে না, তেমনভাবে দেখেনি। বাড়ির কথা বলতো। কিন্তু গ্রুপ সেটিঙে তার উপদ্রব দিনে দিনে বাড়তে শুরু করলো, গ্রুপে সে অন্যদের পড়াশোনায় যখন খুব ব্যাঘাত করতো তখন বাধ্য হয়ে আমাকে মাইকের সাহায্য নিতে হতো। মাইক ছিল একটি খেলার দলের কোচ, এবং ডিসিপ্লিন করতে সাহায্য করতো। মাইককে দেখতে অনেকটা রেসলারের মতো যার এসে দাঁড়ানোটাই ওই বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে ভীতিপ্রদ ছিল। আমার মনে আছে কয়েকবার আমাকে মাইকের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

একবার পরিস্থিতি একটু বেশ খারাপ হয়েছিল। এরপর দুসপ্তাহ সে আসে না; এমন ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটতো। একদিন আমার মাইকের সাথে কথা হচ্ছিলো আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম

“কি ব্যাপার সিজার আর স্কুলে আসছে না?” আমার প্রশ্নটাতে প্রত্যাশিত উত্তর অপেক্ষা করছিলো হয়তো যে ...

এ তো জানারই কথা। “... পড়াশোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল বলে তো মনে মনে হয় না” ... কিন্তু না ... মাইকের আপাত কঠিন মুখে কয়েকটা আঁচড় পড়লো।

“দুদিন স্কুলে আসেনি, কোনো খবর না দিয়ে, তৃতীয় দিন ওর ইমার্জেন্সি কন্টাক্ট লিস্ট থেকে নাম বার করে ওর এক আংকেলকে জোর করেই পাঠিয়েছিলাম। কি হয়েছে জানো একটা শুক্রবার সকালে উঠে সিজার দেখে, ও ওর এপার্টমেন্টে একা।ওর বাবা নিজের কিছু জিনিস নিয়ে চলে গেছে কিছু না বলে ... কিছু না জানিয়ে। একটা ষোলো বছরের ছেলে। ... ও সম্পূর্ণ চুপচাপ এপার্টমেন্টে ছিল, কাউকে কোনো খবর দেয়নি। বোধহয় বুঝতেই পারেনি কি করবে। স্কুলে এতো দুষ্টু, ডাকাবুকো। ষোলো বছরের ছেলে। সকালবেলা উঠে দেখলো সে একা” ...

আমার গালে একটা প্রচন্ড জোরে থাপ্পড়। বুকের মধ্যে মোচড়। ঘরে আমার তখন ওই বয়সের একটা ছেলে। সকালে উঠে ওই বয়সের ছেলে যদি দেখে তাকে ফেলে, কিছু না জানিয়ে সবাই চলে গেছে এবং ওই নতুন আসা দেশে সে একা, কেমন লাগবে তার ? কেমন লাগতে পারে ? আমি কথা বলতে পারিনি। ওকে বলা প্রতি কঠিন শব্দ আমার নিজের কাছেই ফিরে আসছিলো। কি দেখতে পাইনা আমরা। কতটুকু বুঝি।

আজ এতদিন বাদে ফটিকের গল্প পড়ে, ওই না বলতে পারা, না বোঝাতে পারা, নিজের জায়গা থেকে বিচ্যুত হওয়া, প্রিয়জনের ওপরে একটা অসম্ভব অভিমান কিরকম ভাবে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। বারবার মনে হচ্ছিলো কি করে রবীন্দ্রনাথ আপাত, অমোনযোগিতা, অবাধ্যতা, অপ্রতিভ ভাবের আড়াল থেকে উনি ওই বয়সটাকে এভাবে বুঝতে পেরেছিলেন ?

সেভাবেই আমার মনে আছে আমার আর এক ছাত্রী জুলিয়াকে। সে কোনো ক্লাসেই প্রায় কিছু করেনি। এসে ডেস্কে মাথাটা নামিয়ে বসে থাকতো, অনেকবার জিজ্ঞাসা করলে বলতো বস্টন থেকে সাবরাবে যাতায়াত করে ক্লান্ত। তার মুখে অসম্ভব নিস্পৃহতা; খুব ক্লান্ত দেখাতো।জানতাম সে ঠাকুমা আর কাকার সাথে সাময়িক ভাবে থাকে। মা মাস কয়েক আগে রিহ্যাবে গেছেন আর বাবা জেলে, কয়েকবছর। স্টেটের পরীক্ষা কেমন দিলো জানিনা। কিছু সময়ের পর তার মধ্যে পরিবর্তন দেখতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে এক অন্য মানুষ হাসিখুশি, বন্ধুদের সাথে গল্প। আর তার সাথে বুঝলাম সে ইচ্ছে করলেই পড়াশোনা দিব্যি করতে পারে। জানতে পারলাম সে জীবনে প্রথমবার ফস্টার ফ্যামিলি তে আশ্রয় পেয়েছে; একটু বয়স্ক একজন ভদ্রমহিলার কাছে, যার মেয়েরা কলেজে এবং চাকরি করে, এমন পরিবারে।

ভদ্রমহিলা তার মেয়েদের জায়গা দিয়ে জুলিয়াকে গ্রহণ করেছেন। সে কখন বাড়ি ফিরবে, তিনি অপেক্ষা করেন। রাত্রের খাবার একসাথে, গল্প একসাথে। জুলিয়া একদিন বললো, "জানো মিস জীবনে প্রথমবার আমি স্কুল থেকে ফেরার পর আমাকে কেউ খেতে দিলো। আমার এই মা আমার জন্য আমার পছন্দের স্নাক্স কিনে রাখেন ।"

চোখের সামনে জীবনে প্রথমবার, কাউকে শৈশবে ফিরে যেতে দেখছিলাম। ভালোবাসা, মনোযোগ, সময় ... এসবে ভরপুর, মুখচোখ ঝলমলে হাসিতে।

"মা বলেছেন হয়তো আমাকে এডপ্ট করবেন" ।

এরপর দেখা হয় প্রায় দুমাস গরমের ছুটির পর নতুন বছর স্কুল খুললে। দূর থেকে। কোনো স্কুল কাউন্সেলরের সাথে কথা বলছে।

"জুলিয়া কেমন আছো"?

সেই ক্লান্ত দৃষ্টি, নিস্পৃহ শুকনো মুখ ... মনে হলো না কখনো চিনতো

জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় আছো তুমি ?

"বস্টন"

মুখটা ফিরিয়ে চলে গেল ...। ওই শৈশব ফিরে পাওয়া মেয়েটা হারিয়ে গেলো সত্যি বলতে আমি জানিনা কি হয়েছিল। কেন সে আবার ফিরে গেছিলো বস্টন। সমস্যা কোথায় হলো কিছু জানিনি শুধু চোখের সামনে ওকে আশ্রয়চ্যুত হতে দেখলাম।

পোস্টমাস্টারের রতনের মতো ... ছোট বয়সে কারোর কাছে কাজ করতে এসে প্রথম কারোর মনোযোগ, সময়, স্নেহ পেয়েছিলো। আর তাকে ছোট মনের সব ভালোবাসা দিয়ে দিলো। অসুখের সময়ে মা হয়ে তার সেবা করলো। পোস্টমাস্টার যখন চলে যান এবং সম্পূর্ণ ভাবে তাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব অস্বীকার করে,তখন সে বোঝে, ওই আশা ভরসা আশ্রয় সবটাই মিথ্যে। তারপর ওই যে অভিমান, কিছু কাউকে না বলতে পারা সব কিছুর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। সেটাই যেন দেখেছিলাম জুলিয়ার মধ্যে।

এই প্রশ্ন তা মনেই আস্তে পারে কোথায় ১৯২০বা তে বসে লেখা গল্প আর কোথায় আমি তার প্রায় একশো ববছর পরে বসে অন্য দেশে বসে আর একটি দেশে বড়ো হওয়া দুটো ছেলে মেয়েদের মধ্যে মিল দেখতে পাচ্ছি ?

শিকড়ছেঁড়ার মিল; ... সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে নিজের মানুষদের মধ্যে বড় হওয়া একটা বাচ্চা যখন সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে গিয়ে পরে যেখানে সব অন্যরকম। সে অনস্তিত্ব হয়ে যায় ... সেটা প্রকাশ করতে পারে না ... না বলতে পারা, না বোঝাতে পারা, নিজের জায়গা থেকে বিচ্যুত হওয়া, ... প্রিয়জনের ওপরে একটা অসম্ভব অভিমান এই সমস্ত কিছুকে উনি ঠিক পড়ে নিয়েছিলেন।

আর আমরা কিন্তু বয়ঃসন্ধির এই ছেলে মেয়েগুলোর মধ্যে থাকা আশ্রয়হীন ছোট যে প্রাণ, সেটাকে দেখতে পাই না ... আমরা মানসিকভাবে তাদের টেনে হিচড়ে বড় করে দিই, এবং তাদের কাছে বুঝদার বড়োদের মতো ব্যবহার আশা করি। আসলে দেশ, কাল পেরিয়ে যায় এই বয়সটা কিন্তু পাল্টায় না। সেটা ওই প্রায় একশো বছর আগে লেখা গল্পে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন। তাই তিনি তার সময়কে অতিক্রম করে গেছেন। দেশ কাল অতিক্রম করে গেছেন। আর আজ আমাদের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার মধ্যে কি আশ্চর্য ভাবে বেঁচে আছেন।

অদিতি ঘোষদস্তিদার – পেশায় গণিতের অধ্যাপিকা। নেশা লেখা। বাস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে। আনন্দবাজার, সানন্দা সহ সারা পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি থেকে প্রকাশিত অভিব্যক্তির সম্পাদিকা। আমেরিকার মিচিগান থেকে প্রকাশিত উদ্ভাস পত্রিকার এবং কলকাতার কাফে টেবিল প্রকাশনার অবসর পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতেও যুক্ত। প্রিয় বিষয়ঃ ছোট গল্প, অণুগল্প।

অমর্ত্য দত্ত – জন্ম-১৯৮৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মধ্য কলিকাতার একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে । শৈশব থেকেই বাংলা কবিতার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও ভালোবাসা ছিল । পরবর্তী সময় স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে এই জগতে প্রবেশ । গত কয়ক বছর ধরে বিবিধ লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত ও নিয়মিত লেখেন । পেশা : কলিকাতার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত । নেশা : কবিতা ও কবিতা সম্বন্ধীয় সব কিছু.... দ্রষ্টব্য : ২০২০ সালে কবিতায় এ'পার ও'পার ৬ সংকলন-এ, কেয়াপাতা শারদ সংখ্যা ১৪২৭, কবিতাকুটির প্রকাশিত বিভিন্ন সংখ্যায় ও নানাবিধ ই-ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশ পেয়েছে ।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ১৯৬৬ থেকে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও অধ্যাপনার সূত্রে যুক্ত দীর্ঘদিন ধরে। দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহু বই লিখেছেন। কয়েকটি হলো – রবীন্দ্রনাথের মালতিপুঁথি, রবীন্দ্রনাথের সাজঘর, রবীন্দ্রনাথের রেল ভ্রমণ, রবীন্দ্রনাথ কেমন করে লিখতেন, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই ইত্যাদি।

অমৃতা মুখার্জী – সাহিত্যের জগতে পা দিয়েছেন মাত্র তিন বছর। এর মধ্যেই প্রকাশিত ১১টি বই। ইংরাজী ও বাংলায় সমান দক্ষতায় লিখে চলেছেন। প্রথম উপন্যাস হাউস ওয়াইফ চলচিত্রায়ণের পথে, অভিনয়ে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। জনপ্রিয় বই গুলির মধ্যে আছে এক আকাশ কবিতা, কাদম্বিনীস আজকাল। ফাইন্যান্স প্রমিস সর্বোচ্চ বিক্রিত আমাজনে। পেশায় চিকিৎসক। থাকেন আমেরিকার ফ্লোরিডায়। নিজের কবিতা নিজে আবৃত্তি করেছেন মিউসিক ভিডিওতে। যোগাযোগ : ritadoc2012@yahoo.com

বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী – অধুনা উত্তর আমেরিকার নিউজার্সি নিবাসী। বাচিক শিল্পী, আবৃত্তিকার ও সঞ্চালিকা। যাপন কবিতা ও কলম। দীর্ঘ ১৪ বছর বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি অনুরাগ সাহিত্য। কলকাতা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পর এই প্রথম বাতায়নের সাথে সংযুক্ত হওয়া।

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় – জন্ম ৬ জানুয়ারি ১৯৭২ পুরুলিয়া জেলার শিয়ালডাঙা গ্রামে। বাবা কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। মা গীতা গঙ্গোপাধ্যায় । ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির শুরু পারিবারিক আবহে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে কর্মরত। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "সুসংবাদ কিনতে যাব", "হাইফেন বসানো বারান্দা", "বিভ্রম রঙের মেঘ", "অপেক্ষা খরচ করি", "নিরুত্তর প্রশ্নের দ্রাঘিমা", "আঁধারে অঘ্রান", "দূরত্বের প্রতিধ্বনি", "নিরাময় আলোর উৎসাহে", "Symbolic Solitude", প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ঃ "প্রান্তিক জানালা" ও অন্যান্য গল্পএবং অস্পৃশ্য হাত। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ "আক্রান্ত বৃষ্টিদিন", "মাটির মহক", ছড়া – রাঙা মাথায় চিরুনি সম্পাদিত পত্রিকা কেতকী। পুরস্কার ও সম্মাননা ত্রিবৃত্ত পুরস্কার। মালীবুড়ো সম্মান। অনুপত্রী সাহিত্য পুরস্কার। কফিহাউস পুরস্কার। পূর্বাশা পুরস্কার। খড়গপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের বর্ষসেরা অনন্য সম্মান। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার। জিরাফ পুরস্কার সহ বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন।

দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় – জন্ম ওডিশার পুরী সহরে এবং ছোটবেলা ওখানেই কেটেছে । কটকের রেভেনশ কলেজ থেকে B.Sc. শেষ করে IIT-Kharagpur এ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া । তার পরে আমেরিকা আসা উচ্চশিক্ষার জন্য । কর্ম জীবন কেটেছে ব্যস্ততার মধ্যে, সাহিত্য চর্চা প্রায় মাথায় উঠে ছিলো । অবসর নেয়ার পরে ছোটোবেলার পাগলামি আবার ফিরে এসেছে । এখন নিউ জার্সি বাসী বিভিন্ন বাঙালি সংস্থার সঙ্গে জড়িত । মাঝে মাঝে কবিতা লেখাতে এবং বাঙালি অভিবাসীদের ইতিহাসের গবেষণা করাতে সময় কাটে ।

জয়তী রায় – বাড়ি কলকাতা। আদতে ভ্রামণিক। ঘুরে বেড়াই এক দেশ থেকে অন্য দেশ। কখনো থাইল্যান্ড, কখনো আমেরিকা, কখনো লন্ডন। মূলত কাজ করি, মানুষের মন নিয়ে। নেশা সাহিত্য। লিখি ছোটগল্প। পৌরাণিক চরিত্র। এবং মনোসত্ত্বিক বিষয় নির্ভর নিবন্ধ। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত বই দ্রৌপদী, মুহূর্তকথা, ব্রহ্মকমল, সুপ্রভাত বন্ধুরা। ২০১৯-এ প্রকাশিত জনপ্রিয় বই ছয় নারী যুগান্তকারী। প্রকাশনা : পত্রভারতী ।

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায় – বেড়ে ওঠা কলকাতায়, বসবাস বস্টনে। লেখালেখি শুরু ২০১৬ তে। ছোট গল্প এবং আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে বাংলা লাইভ, পরবাস, কল্পবিশ্ব ওয়েব ম্যাগাজিনে, আনন্দবাজার, সাপ্তাহিক বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন, রোববারে। ২০২০র বইমেলায় প্রকাশিত প্রথম বই-ছোট গল্প সংকলন-ক্যালাইডোস্কোপ, দে'জ পাবলিকেশন থেকে।

ডঃ মৌসুমী ব্যানার্জী – ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্টাটিস্টিক্সের অধ্যাপক। গবেষণার বিষয়বস্তু অঙ্ক দিয়ে অনকোলজি-র সমাধান। জন্ম কলকাতায়, লেখাপড়া কলকাতার পাঠভবন স্কুলে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট এবং পরবর্তীকালে ডক্টরেট উপাধি আমেরিকার উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মসূত্রে বিশ্বনাগরিক। পেশাগতভাবে মৌসুমীর বাস ঘোর বিজ্ঞানের জগতে। বিজ্ঞান ওঁকে দেয় ইন্টেলেকচুয়াল স্টিমুলেশন, কিন্তু সাহিত্য সংগীত মৌসুমীর কাছে ঘরে ফেরা, জ্বরের মাথায় মায়ের হাতের জলপট্টি, পরম নির্ভরতা। লেখালেখির শুরু কলেজ জীবন থেকেই। মৌসুমীর কবিতায় নাগরিক একাকিত্ব এবং জীবনের সঙ্গে জীবন সম্পৃক্ত করে বাঁচা, পাশাপাশি রয়েছে অপলক মুগ্ধতায়। বাড়ি বদলে গেছে, দেশ বদলে গেছে, তবু মৌসুমীর কবিতায় আজও সেই সুরকিখানা দেওয়ালের গায়ে টিকটিকি আটকে থাকা মুহূর্তের অপাপবিদ্ধ ছবি।

নাভিদ সালেহ – ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস, অস্টিন-এ পরিবেশ প্রকৌশল অনুষদে অধ্যাপনা করছেন। নাভিদ কলেজ জীবনের উত্তাল সময় থেকেই বাংলাদেশের সাহিত্য সাময়িকী "শৈলী" এবং বিতর্ক বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি করতেন। ২০১২-র একুশের বইমেলায়, সমসাময়িক সমাজ চিন্তা, দর্শন, সংস্কৃতি, এবং পরিবেশ বিষয়ে লেখা নিবন্ধ নিয়ে, প্রকৃতি প্রকাশনী থেকে "দর্শন ভাবনা" শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। জল-বিশোধন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনার ব্যস্ততার অবসরে নাভিদ তার সমাজ ও দর্শন ভাবনা নিয়ে লেখেন। তিনি ইংরেজী একটি ব্যক্তিগত ব্লগ সাইট (https://navidsaleh.wixsite.com/website-1) -এ এবং হালের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার এ লেখাগুলো প্রকাশ করছেন। স্ত্রী সাবরিনা ও পুত্র ঈশান-কে নিয়ে নাভিদ টেক্সাসের অস্টিন শহরে থাকেন।

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

প্রচেত গুপ্তর জন্ম ১৯৬২ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায়। বাবা ক্ষেত্র গুপ্ত, মা জ্যোৎস্না গুপ্ত শিক্ষা জগতের মানুষ। ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক ভাবে সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন। অর্থনীতিতে স্নাতক হয়ে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। অল্পদিনেই লেখক হিসেবে জনপ্রিয়। ইংরেজি, হিন্দি, ওড়িয়া সহ বিভিন্ন ভাষায় গল্প অনুবাদ হয়েছে। বিশিষ্ট পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর চাঁদের বাড়ি উপন্যাসটি নিয়ে চলচ্চিত্র করেছেন। এছাড়াও তাঁর বহু গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র, নাটক, টেলিফিল্ম হয়েছে। বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত সুতপা রায়চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন।

সংগ্রামী লাহিড়ী – ইঞ্জিনিয়ার, পেশায় কনসালট্যান্ট। শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়ে বহুদিনের চর্চা। অল ইন্ডিয়া রেডিওর এ গ্রেড শিল্পী। লেখালেখির অভ্যাসও ছোট্টবেলা থেকে, বাবা-মা'র উৎসাহে। বর্তমানে কর্মসূত্রে নিউ জার্সির পারসিপেনি শহরে বসবাস। তবে বিদেশে বসেও সাহিত্যচর্চা চলে জোর কদমে। নিউ জার্সি থেকে প্রকাশিত 'অভিব্যক্তি' ও 'অবসর' পত্রিকার সম্পাদক। এছাড়া 'পরবাস', 'উদ্ভাস', 'প্রবাসবন্ধু', 'টেকটাচটক', 'গুরুচণ্ডা৯', ইত্যাদি ই-ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখিকা।

সঞ্জয় চক্রবর্তী – অধুনা সিডনী নিবাসী। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক। বাতায়ন থেকে প্রকাশিত সঞ্জয়ের প্রথম কবিতার বই "মেঘযাপন" পাঠক মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সঞ্জয়ের অন্য পরিচিতি গীতিকার হিসেবে। কলকাতার জনপ্রিয় গায়ক ও সুরকারেরা সঞ্জয়ের লেখা গানে কাজ করছেন।

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় – ঐতিহ্যময় শহর চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক। ১৯৯৬ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'দিবারাত্রির কাব্য' পত্রিকায়। ২০০১ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'তথ্যকেন্দ্র', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছাড়াও, 'অনুষ্টুপ', 'কুঠার', এবং 'মুশায়ারা'-র মতো বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা অব্যাহত। প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটি, গল্পগ্রন্থ তিনটি, এবং কবিতার বই একটি।

শ্যামলী আচার্য – কর্মসূত্রে 'আজকাল', 'আবার যুগান্তর', 'খবর ৩৬৫' ও অন্যান্য বহু পত্র-পত্রিকায় এবং ওয়েবজিনে ফিচার এবং কভারস্টোরি লেখার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। 'একদিন' পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে কাজের সুযোগ। গাংচিল প্রকাশনা থেকে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'অসমাপ্ত চিত্রনাট্য'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, এই সময়, তথ্যকেন্দ্র পত্রিকায় প্রকাশিত। "রা" প্রকাশন থেকে তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'প্রেমের ১২টা'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, একদিন, প্রাত্যহিক খবর এবং বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। বহুস্বর পত্রিকার পক্ষ থেকে মৌলিক গল্প রচনায়

'অনন্তকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার'। অভিযান পাবলিশার্স আয়োজিত মহাভারতের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক গল্প রচনায় প্রথম পুরস্কার। এছাড়াও গবেষণাঋদ্ধ বই 'শান্তিনিকেতন'। প্রকাশক 'দাঁড়াবার জায়গা'। ১৯৯৮ সাল থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের এফ এম রেইনবো (১০৭ মেগাহার্তজ) ও এফ এম গোল্ড প্রচারতরঙ্গে বাংলা অনুষ্ঠান উপস্থাপিকা। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের ভয়েস ওভার আর্টিস্ট।

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় – উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড ও মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার শেষে কিছুদিনের শিক্ষকতা-জীবন। তারপরেই প্রবাসে পাড়ি। গত বাইশ বছর যাবৎ ঠিকানা নিউ জার্সি। পেশায় মন্তেসরি শিক্ষিকা। ২০০৮ সাল থেকে ছদ্মনামে ব্লগলেখা শুরু। ২০১০ থেকে বিভিন্ন দেশ ও বিদেশের পত্রপত্রিকা ও শারদীয়াতে নিজের নামে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা চলতে থাকে, কমিউনিটির বিভিন্ন ভলেন্টারি কাজের পাশাপাশি নাটক ও সঞ্চালনা করে সময় কাটাতে ভালবাসেন।

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

অধমের নাম **সুপ্রতীক মুখার্জী** । পার্থিব বাসিন্দা । ৯টা-৫টার চাকর । পিদিমের মত টিম্‌টিমে বুদ্ধি, তা'ও নেভে না !!

Dr. Surajit Roy — Assit. Professor, Visva Bharati Santiniketan, Sangeet Bhavana, Dept. of Rabindra Sangeet Academic Qualification : MA PhD (Rabindra sangeet). An eminent Esraj player as well as a Rabindra Sangeet Singer. Dr. Roy took part so many prog. and seminars all over the world. B high artist in all India radio. Recently, three NET JRF Scholar Students, doing PhD, under his guidance.

সুস্মিতা রায়চৌধুরী – নিউজার্সি নিবাসী একজন ব্লগার, বাচিকশিল্পী এবং লেখিকা। ষোল বছর বয়সে প্রথম রচনা প্রকাশ পায় "দি টেলিগ্রাফ"-এর পাতায়। সেই থেকেই শুরু নিয়মিত লেখার অভ্যেস। সানন্দা, আনন্দবাজার, প্রতিদিন, দি ওয়ালে ফিচার লেখা ছাড়াও উনি নিয়মিত লিটল ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন দেশ-বিদেশের ই-ম্যাগাজিনে গল্প, ধারাবাহিক, অণুগল্প, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, নাটক লিখে থাকেন। ওড়িশি নৃত্যে সিনিয়র ডিপ্লোমা করা এই মানুষটির পছন্দ আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক, থিয়েটার এবং দেশবিদেশ ভ্রমণ।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী' । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

VISVA-BHARATI

ISBN 978-0-6487688-5-2